

জানবাজারের
রাণীমা

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

মোহন লাইব্রেরী
৩৫এ, মির্জাপুর ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীজীবনকুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত
৭।১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
শ্রীসমরেন্দ্র সাহা
ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স
৯, এণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন :
বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

জানবাজারের রাণীমা

জানবাজারের রাণীমা

বাবা, আবার পড়ো শুনবো, আমার বেশ ভাল লাগছে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি কথা ভেসে এলো এক প্রৌঢ় ব্যক্তির কানে।

পিতা পড়ছিলেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ। বেশ সুরেলা কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সাত বছরের মেয়েটি বাদ সাধলো।

স্নেহময় পিতা পড়া থামিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন একবার সুন্দরী কন্যার চন্দ্রমুখের পানে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকাতে পারলেন না। হোক সে তাঁর একটিমাত্র কন্যা-সন্তান তথাপি তাঁর মনে পড়লো উপস্থিত কর্তব্যের কথা। তাঁর সামনে বসে আছে অগণিত শ্রোতা—স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি তাদের সন্তান-সন্ততিরাও। তাঁরা শুনতে এসেছেন রামায়ণ। প্রৌঢ়ের মুখে এমন মিষ্টি সুর আর কখনো শোনেন নি তাঁরা। এমন সুরেলা কণ্ঠ আর কি দ্বিতীয়টি মিলবে ঐ গাঁয়ে!

প্রৌঢ় আরম্ভ করলেন পড়তে। সেই সুরেলা কণ্ঠে হেলেদুলে পাঠ শুরু হলো। বিষয়টি হলো হনুমানের লঙ্কাদহন-লীলা।

'…মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়॥
সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেনমতে অগ্নি বীর করে সমর্পণ॥
মেঘের বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে॥

পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে॥
উনপঞ্চাশ বায়ু আসি হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্বাণ অগ্নি কেবা কারে বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
স্ত্রী-পুরুষের অর্ধেক পুড়ে গেল ছাল॥'···

ছোট্ট মেয়েটি পিতার মুখের দিকে স্থিবনয়নে তাকিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে দর্শকদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে। রামায়ণ পড়ার সময় পিতা কেমনভাবে হাত নাড়ান, অঙ্গভঙ্গি করেন এত জিনিস দেখার উৎসাহ তার বেশি। সে ওতে বিশেষ এক কৌতূহল বোধ করে। বিশেষত হনুমানের ক্রিয়া-কলাপের চিত্র শিশুমনে এক রোমাঞ্চকর পটভূমিকার সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে সেই কৌতূহল এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে তা সশব্দে প্রকাশ পায় সমুদ্রবক্ষে উত্তাল ঊর্মিমালার মত। তার জন্যে সভায় গোলের সৃষ্টি হলেও কোন দর্শকের কাছ থেকে আপত্তি ওঠে না। কেননা সকলে ভালবাসত ঐ মেয়েটিকে। সে ছিল সবার নয়নের মণি। ফলে তার দোষত্রুটি দেখে পিতার মনে ক্রোধের সঞ্চার হলেও তিনি তা দমন করে নিতেন। সকলের ভালবাসার প্রবাহে তাঁর ক্রোধবহ্নি হতো নির্বাপিত। তিনি আপন মনে পড়ে যেতেন রামায়ণ তেমনি জোরালো অথচ সুরেলা কণ্ঠে। তেমনি নাটকীয় হাবভাব প্রকাশ করতেন। যেখানে কাঁদবার দরকার হতো সেখানে কাঁদতেন আবার যেখানে হাসবার প্রয়োজন বোধ করতেন সেখানে হাসতেন। যাক, তাঁর পড়ার গুণে সভার পরিবেশে এক আনন্দমধুর ভাব জেগে উঠতো। তার মোহময় আকর্ষণে কেউ

একচুল পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারতো না। চিত্রার্পিতের মত শুনতো। রাত অনেক হয়ে যেত, শিশু সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়তো কিন্তু অভিভাবকগণ কান পেতে তন্ময় চিত্তে শুনে যেতেন।

এমনি সুন্দর প্রকাশভঙ্গী এবং বলবার কায়দা ছিল ঐ প্রৌঢ়ের। উনি ছিলেন গ্রামের নামকরা রামায়ণ-মহাভারতের পাঠক।

ঐ প্রৌঢ়ের নামই হরেকৃষ্ণ দাস। আর কন্যাটি রাসমণি, যিনি উত্তরকালে বাংলার জনমানসে সশ্রদ্ধ প্রীতির আসন লাভ করেছিলেন।

বাংলা ১২০০ সাল। চব্বিশ-পরগনা জেলার হালিসহরের নিকটবর্তী কোনার গ্রাম। ঐ গ্রামেই হরেকৃষ্ণ দাসের ঔরসে ও রামপ্রিয়া দাসীর গর্ভে জন্ম নেয় রাসমণি।

রাসমণি হচ্ছে হরেকৃষ্ণ দাসের বেশি বয়সের সন্তান। তাঁর অন্যান্য সন্তানও ছিল। তথাপি রাসমণির ওপর তাঁর স্নেহ ছিল অধিক।

হরেকৃষ্ণ জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। তাঁর গ্রামের অন্যান্য স্বজাতি লেখাপড়া তত জানতেন না। কিন্তু হরেকৃষ্ণ নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। সামান্য আক্ষরিক জ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে অল্প ধারণা তাঁর ছিল। এর পর তিনি বাড়িঘর তৈরীর কাজ জানতেন। তাই গ্রামে তাঁর নামডাক ছিল বেশ। সকলের মাঝে তিনি ছিলেন মুরুব্বি। অনেকে তাঁর কথা শুনতো। উপদেশ চাইলে কিছু কিছু যে না পেত এমন কথা বলা যায় না। কেননা, হরেকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। যতটা তিনি জানতেন তার চেয়ে কম প্রকাশ করতেন।

দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল হরেকৃষ্ণের। সংসারে কাজের ফাঁকে অবসর পেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত পাঠ করতেন। তাঁর পাঠ শোনবার জন্যে গ্রামের লোকেরা আসতো। আর শুনতো রাসমণি। রাসমণি ছিল তাঁর সকলের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রোতা। কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটতো যে রাসমণি তাঁর কোলের ওপর বসে তাঁর পাঠ শুনতো।

রামায়ণে হনুমানের কীর্তিকাহিনী শুনতে অধিক ভালবাসতো রাসমণি। কেমন করে হনুমান বীর আখ্যা লাভ করলে, সেকথা হরেকৃষ্ণ দাস বুঝিয়ে দিতেন গল্পচ্ছলে তাঁর আদরিণী কন্যা রাসমণি তথা রাস্নকে।

রাসমণি অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে তন্ময় হয়ে পিতার কাছ থেকে সেসব কথা শুনতো।

হনুমান ছিল সত্যিই বীর। তার গায়ে বল ছিল অসাধারণ। তা না হলে কি সে একলাফে ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কায় চলে যেতে পারতো!

কেবল তাই নয় রাবণের অনুচররা যখন মজা দেখবার জন্যে হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দিলে তখন হনুমান কিন্তু তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত হয় নি। সে ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিবলে রাবণের চেড়ীদের সামনে এমন একটি মজার খেলা দেখিয়ে দিলো, যার ফলে রাবণের চেড়ীরা ভয় পেয়ে যে যার ঘরে প্রবেশ করে গা ঢাকা দিলো।

আগুনের ভয় তো সকলের আছে। হনুমান যখন তার ল্যাজে বাঁধা আগুন নিয়ে লঙ্কানগরীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো সেই সময় বহু ঘরদোর আগুন লেগে জ্বলে উঠলো। তখন রাবণের অনুচরবৃন্দ ভয় পেয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের চোখের কোলে জল জমে উঠলো। মজার হাসি গেল মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে।

ঐ কথা শুনে বালিকা রাসমণির চোখেও জল এলো। চেড়ীদের

দুর্দশা তার অন্তরকেও বিদ্ধ করলো। হনুমানের বীরত্ব কাহিনী শুনে সে যেমন আনন্দ প্রকাশ করতো তেমনি চেড়ীদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শুনে তার অন্তর দুঃখপূর্ণ হয়ে গেল।

সে ক্ষণিকের জন্যে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলো। মনোযোগ দিয়ে পিতার কথা শুনলো না। পিতা তখন জিজ্ঞেস করলেন, রাসু, তুই কেন আমার কথা শুনছিস নারে! কি হয়েছে তোর?

রাসু চুপ করে রইলো। কোন উত্তর দিলো না। তখন হরেকৃষ্ণ তার থুতনিতে হাত দিয়ে মুখটা ওপরের দিকে তুলে ধরলেন। রাসুর দু'চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। দেখলেন, তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, তোর চোখে জল কেন? কি হয়েছে?

রাসমণি উত্তর দিলো না। চুপ করে রইলো। হরেকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে—বল্ না? আমি কিছু বলবো না।

এবারও রাসমণি নিরুত্তর।

হরেকৃষ্ণ আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। ভাবলেন, আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলে হয়তো খারাপ হতে পারে। আমার রাসুর হয়তো আরও দুঃখ হবে।

তাই দুঃখকে ভোলাবার জন্যে তিনি আবার সব মজার মজার কথা বলতে লাগলেন। বললেন, রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা। রাবণের ছিল দশ মুণ্ড আর বিশ হাত। রাম তো অত বড় বীর। তাঁর অস্ত্রবলও ছিল। তথাপি তিনি বীর রাবণকে সহজে বধ করতে পারছিলেন না। তাঁর মারা অনেক অস্ত্র রাবণ অনায়াসে প্রতিহত করতে লাগলো। শেষকালে রাবণের ভাই বিভীষণ রামের কাছে এসে বলে দিলো, অমুক জায়গায় রাবণবধের গোপন অস্ত্র আছে। সেটা উদ্ধার করে এনে প্রয়োগ করলে তবে ওকে মারা সম্ভব হবে।

রাম সেই খবর শুনে বিভীষণের কথামত কাজ করে নিজের কাজ উদ্ধার করলেন। যুদ্ধে রাবণ নিহত হলো।

রাসমণির চোখেমুখে এবার আনন্দজ্যোতি খেলে গেল। সে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলো, বিভীষণ কে বাবা ?

হরেকৃষ্ণ বললেন, তুই একটা বোকা মেয়ে। বিভীষণ কে তা তুই জানিস না ? সে হচ্ছে রাবণরাজার ভাই।

তখন রাসমণি বললে, সে কেন রামচন্দ্রের কাছে ভাইয়ের মৃত্যুবাণের কথা বললে ?

হরেকৃষ্ণ বললেন, বিভীষণ যে রামের বন্ধু। তাই বন্ধু হয়ে বন্ধুর বিপদের দিনে সাহায্য করার জন্যে এমন কথা বলেছে।

এবার রাসমণি শান্ত হলো।

হরেকৃষ্ণ তার বুদ্ধির দৌড় তারিফ করতে লাগলেন। এতটুকু বয়সে তার বিচার-বিবেচনা শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

এর পর মহাভারত ও পুরাণের অনেক কাহিনী শুনতো রাসমণি পিতা হরেকৃষ্ণের কাছে।

মহাভারতের সাবিত্রী ও সত্যবানের কথা রাসমণির কাছে বড় প্রিয় ছিল।

পিতা হরেকৃষ্ণ বলতেন, সুন্দরী এবং সর্বগুণসম্পন্না কন্যা সাবিত্রী। রাজা অশ্বপতির একমাত্র কন্যাসন্তান। তাই সে আদরিণী। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজা উপলব্ধি করতে পারলেন যে তার বিয়ের প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি একদিন কন্যাকে সস্নেহে নিজের কাছে আহ্বান জানিয়ে বললেন, বৎসে ! তুমি এখন পূর্ণযৌবনা এবং বিবাহযোগ্যা। অতএব তুমি এবার পতি-নির্বাচন করার জন্যে বিভিন্ন রাজসভায় যাও। আমি তোমাকে পতি-নির্বাচনের স্বাধীনতা দিচ্ছি।

পিতার কথা শোনামাত্র খুশী হলো সাবিত্রী। উপযুক্ত সময়ে পিতাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করলো সাবিত্রী। সুবর্ণ রথে আরোহণ করে চলতে লাগলো। সঙ্গে চললো সৈন্য-সামন্ত এবং রাজার সভাসদ্‌গণ।

কয়েকটি রাজসভায় প্রবেশ করলো সাবিত্রী। যুবক এবং অবিবাহিত রাজপুত্রগণ সকলে একবাক্যে জানালো, আমরা তোমাকে সুখে রাখবো। তোমার কোন দুঃখ নেই। অভাবের করাল ছায়া তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি মহাসুখে ধনদৌলতের মধ্যে আনন্দে কাল কাটাবে!

সাবিত্রী ছিল বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে দেখলো, ধনদৌলতই জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস নয়। তার চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে প্রাণ। প্রাণের ভালবাসা। সে জিনিস এই রাজপ্রাসাদে দুর্লভ, এখানে রয়েছে অর্থ এবং জাঁকজমক। মানুষ এখানে অর্থের নিকট বিক্রীত—ন্যায়নীতির ওজন হয় অর্থের বিনিময়ে। সুতরাং এরকম জীবন আপাতসুখকর হলেও পরিণাম অতি দুঃখাবহ। এই চিন্তা করে সাবিত্রী সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লো পথে।

এখন সে যাবে কোথায়? তার সঙ্গে যে সমস্ত লোকজন গিয়েছিল তারা একত্রে প্রশ্ন করলো, রাজপুত্রী! আপনি এখন কি রাজপ্রাসাদে ফিরবেন?

সাবিত্রী বললে, না, আমি যাবো তপোবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চলো। তবে একটা কথা আছে, আমি যখন কোন আশ্রমে প্রবেশ করবো তখন যেন তোমরা সেখানে যেও না।

লোকজন সাবিত্রীর কথা শুনলো।

যথাসময়ে সাবিত্রী একটি তপোবনে প্রবেশ করলো। প্রাচীন-কালে এই সমস্ত তপোবনে পশুরা নির্ভয়ে বাস করতো। সেখানে

কেউ জীবহত্যা করতো না বলে পশুরা মানুষদের দেখলে হিংস্রভাব প্রকাশ করতো না।

সাবিত্রী অরণ্যের মধ্যে নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে লাগলো। পথে দু'চারটি জন্তুজানোয়ারের দেখা পেল। তাদের মধ্যে সে শান্তভাব লক্ষ্য করলো। যেন তারা সাবিত্রীকে চেনে। তাকে ভালবাসে। সে তাদের কাছে কত আপনজন। তাদের মধ্যে ঐ প্রকার ভাব লক্ষ্য করে মনে মনে আনন্দিত হলো সাবিত্রী। ভাবলে এরা কত সুন্দর এবং শান্ত। কেমন অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাপন করছে। কত বড় শান্তি রয়েছে মনের মধ্যে। আর আমি বাস করি রাজবাড়িতে। আবার গিয়েছিলাম রাজপ্রাসাদগুলিতে পতি নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়ে। সেখানে সুখ কোথায়? আছে কেবল আড়ম্বর, জঁাকজমক আর বিলাস।

এইসব চিন্তা করতে করতে এগুতে লাগলো সাবিত্রী। বহু মুনিঋষি নজরে পড়লো। তাঁরা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন।

অবশেষে এমনি একটি তপোবনে এলো সাবিত্রী যেখানে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা বাস করছিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হলে শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে এবং তাঁকে পরাভূত করে রাজ্য অধিকার করে।

তখন নিরুপায় হয়ে অসহায় বৃদ্ধ রাজা তাঁর মহিষী এবং পুত্রের সঙ্গে এলেন এই তপোবনে। সেখানে একটি ছোট আশ্রম-কুটির প্রতিষ্ঠা করে সুখে বাস করতে লাগলেন। ঐ সময় তাঁর নিত্যকার জীবন ছিল প্রার্থনাপূর্ণ। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবকরূপে জীবন কাটাতে লাগলেন। তাঁর পুত্রের নাম সত্যবান।

দূর থেকে সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের আশ্রমকুটির দেখতে পেল। এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। আর একটি কারণ ছিল তার যাওয়ার অন্তরালে। কারণ ঐ আশ্রমের বাইরে অপেক্ষা করছিল সত্যবান।

তার সুপুরুষের মত রূপ এবং নবীন যৌবন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সাবিত্রী। সঙ্গে যারা আসছিল তাদের আর এগুতে নিষেধ করে বললে, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি এবার আশ্রমে প্রবেশ করছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে অপেক্ষা করো।

এই বলে সাবিত্রী এগিয়ে গেল আশ্রমের দিকে।

প্রথম দর্শনেই সে সত্যবানকে ভালবেসে ফেললো। তাঁর কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে এসে বললো, আপনি রাজপুত্র। আপনি বড় সুন্দর। আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে ইচ্ছুক।

সত্যবান বললে, আমি এখন দীনহীনের পুত্র। এককালে ছিলুম বটে রাজপুত্র। এখন আমার বৈষয়িক অবস্থা বড় মন্দ। আমি ভিখারী। ভিখারীর পক্ষে আপনার স্থায় সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করা অন্যায়। তাছাড়া আপনার রূপ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি কোন রাজার কন্যা। দয়া করে আপনার পরিচয় একটিবারের জন্যে কি জানতে পারি?

সাবিত্রী মৃদু হেসে বললে, আমার নাম সাবিত্রী। আমি রাজা অশ্বপতির কন্যা। পিতা আমাকে বললেন, পতি-নির্বাচন করতে। সেই কারণে আমি পতি-নির্বাচনে যাত্রা করেছি। অনেক রাজা-রাজড়ার স্বয়ংবর সভায় গেলুম। দেখা হলো অনেক রাজপুরুষের সঙ্গে। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেই পছন্দ হলো না। তাই নিরাশ হয়ে তপোবনে প্রবেশ করলুম। ভাবলুম, এখানে কোন আশ্রম-কুটিরে গুরুগৃহে অবস্থানকারী কোন সদ্যুবকের সঙ্গে দেখা হবে। তাকেই আমার পতি—মনের মানুষ বলে নির্বাচিত করবো।

এই আশায় বুক বেঁধে আমি আজ এসেছি আপনার কাছে। আপনি সেই মনের মানুষ। আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিন।

সাবিত্রীর কথা শুনে কুটিরবাসী সত্যবান বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, আপনি রাজপুত্রী হয়ে রাজাকে বিয়ে করবেন। এইটিই আপনার পক্ষে শ্রেয় কাজ। তা না করে আপনি আমার মত একজন দীনহীনের কুটিরে এসে তাঁর পুত্রবধূ হতে চান? এ কি রকম কথা? এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া আপনার পিতা এ কথা শুনলে বলবেন কি?

সাবিত্রী নির্দ্বিধায় বললে, সে ভার আমার। পিতা আমাকে যখন পতি-নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন তখন আমি এ যাত্রায় সফল হবোই। আমি এখন রাজসভায় ফিরে গিয়ে পিতার নিকট আমার মনোবাসনা নিবেদন করলে উনি অসম্মতি প্রকাশ করতে পারবেন না।

সত্যবান আর কোন কথা বলতে পারলো না। নীরবে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে লাগলো সাবিত্রীর প্রেমপূর্ণ চাহনির নিগূঢ় ভাষা। সত্যবান ভাবতে লাগলো সাবিত্রীর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সরল প্রাণের অকৃত্রিম ভালবাসা। সেখানে কোন ছলাকলা নেই। কিন্তু সে কি যোগ্য সাবিত্রীর মত রূপময়ী এবং বহু গুণে গুণান্বিতা রাজপুত্রীকে ভালবাসার?

এমনি অনেক রকম প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো তপস্বী সত্যবানের হৃদয়ে।

অবশেষে চিন্তা ত্যাগ করে আশ্রমে ফিরে গেল বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার প্রয়োজনে। আর সাবিত্রীও সদলবলে যাত্রা করলো পিতার পরিত্যক্ত আশ্রমকুটিরের দিকে।

পিতার নিকট ফিরে এসেছে সাবিত্রী। তার মনে আনন্দ আর ধরে না। একে সে রূপসী তার ওপর অন্তরের অকৃত্রিম আনন্দ তাকে

আরও সুন্দরী করে তুলেছে। সাবিত্রীর সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের চিত্তও আনন্দময় হয়ে উঠলো।

গুনগুন সুরে গান গাইতে গাইতে পিতার আলয়ে প্রবেশ করলো সাবিত্রী। পিতা তার মনের স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থা জানতে পেরে প্রশ্ন করলেন, বৎসে সাবিত্রী! তুমি তো নানা জায়গায় ভ্রমণ করলে। বলো দেখি, তুমি কোথাও এমন কাউকেও দেখেছ কি যার সঙ্গে তুমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে ইচ্ছে করো? বলো মা, কিছুমাত্র গোপন না করে হৃদয়ের কথা খুলে বলো।

সাবিত্রী তখন লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ পিতা, দেখেছি।

পিতা বললেন, বৎসে! যে রাজকুমার তোমার চিত্ত হরণ করেছে তার কি নাম?

সাবিত্রী বললে, তাঁকে এখন ঠিক রাজা বলা যায় না। কেননা তাঁর পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে কিন্তু এখন শত্রুরা তাঁর রাজ্য অপহরণ করেছে। অতএব যিনি রাজকুমার হয়েও রাজ্যের অধিকারী নন তিনি তপস্বীভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করে কুটিরবাসী বৃদ্ধ জনকজননীর সেবায় নিয়ত আছেন।

সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন দেবর্ষি নারদ। রাজা অশ্বপতি তাঁর কাছে সাবিত্রীর সদ্যসমাপ্ত পতি-নির্বাচনের কথা বলে পরে প্রশ্ন করলেন, হে ঋষিবর! আপনি দয়া করে বলুন, আমার কন্যা তার পতিকে ঠিকভাবে নির্বাচিত করেছে কিনা?

রাজার কথা শুনে দেবর্ষি নারদ বললেন, হে রাজন। আপনার কন্যার এই নির্বাচন বড়ই অশুভ হয়েছে।

দেবর্ষির কথা শোনামাত্র দুঃখিত হলেন রাজা অশ্বপতি। স্খলিত কণ্ঠস্বরে বললেন, দেবর্ষি! কি কারণে এরূপ নির্বাচন অশুভ হয়েছে তা আমার কাছে দয়া করে বলুন। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

দেবর্ষি বললেন, আজ থেকে বারো মাস পরে সত্যবান নিজের কর্মানুসারে দেহত্যাগ করবে।

দেবর্ষি নারদের কথা শুনে ভয়বিহ্বল রাজা তাঁর কন্যাকে বললেন, সাবিত্রী! শুনলে তো, আজ হতে বারো মাস পরে সত্যবান দেহত্যাগ করবে। অতএব তুমি তাকে বিয়ে করলে অল্প বয়সেই বিধবা হবে। একবার একথা বেশ ভাল করে ভেবে দেখো। বৎসে! তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না। এমন অল্পায়ু আসন্নমৃত্যু বরের সঙ্গে তোমার কোনমতে বিয়ে হতে পারে না।

সাবিত্রী বললে, পিতা! সত্যবান অল্পায়ুই হোক বা আসন্ন মৃত্যুই হোক তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতি অনুরাগী। আমি মনে মনে সেই সাধুচরিত্র বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করেছি। অতএব আপনি অন্য লোককে পতিরূপে বরণ করতে আমাকে বলবেন না। তাহলে আমি হবো দ্বিচারিণী। কুমারীর পতি-নির্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবার সে যাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকেও তার মনে কখনো স্থান দেওয়া উচিত নয়।

রাজা অশ্বপতি ভাবলেন, তাঁর কন্যা যখন সত্যবানকে বিয়ে করতে দৃঢ়নিশ্চয় তখন তাকে অযথা বাধাদান করা উচিত হবে না। তাছাড়া তিনি ত তাকে দিয়েছেন পতি-নির্বাচন করার স্বাধীনতা। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে ঘটা করে বিয়ে দিলেন সত্যবানের সঙ্গে।

বিয়ের পরে সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে গিয়ে যথারীতি বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করতে লাগলো। শহরের বিলাসবহুল নাগরিক জীবন হতে সে ফিরে গেল তপোবনের অনাড়ম্বর সরল জীবনে।

ইতিমধ্যে নারদের মুখ হতে শুনেছে সাবিত্রী কবে সত্যবান

দেহত্যাগ করবে। কিন্তু সেই দিনক্ষণের কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করলো না।

এদিকে সত্যবান প্রতিদিন কাঠ সংগ্রহ করার জন্যে বনে যায়। সাবিত্রীও একমনে শ্বশুর-শাশুড়ী এবং পতির সেবায় মনোসংযোগ করে।

অবশেষে সত্যবানের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলো। আর মাত্র তিনদিন বাকি আছে এই মহাকাল আসতে।

এখন থেকে অর্থাৎ এই তিনদিন তিনরাত্রি ধরে সাবিত্রী ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে তার পতির মঙ্গলের জন্যে। অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে তার এই তিনদিন।

পরে তিনদিনের দিন সকালে সাবিত্রী ঠিক করলো, সে যাবে তার স্বামীর সঙ্গে অরণ্যে কাঠসংগ্রহ করতে।

বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে এসে বললো, আপনারা দয়া করে আমায় অনুমতি দিন যাতে করে অরণ্যে আমি স্বামীর অনুগামিনী হতে পারি।

বৃদ্ধ শ্বশুর পুত্রবধূর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, তুমি যাবে অরণ্যে ?

সাবিত্রী বললে, হ্যাঁ যাবো। আমি যাবো। আমাকে আজ যেতেই হবে।

—কিন্তু কেন ? তার কারণ জানতে পারি কি ?

—আমার মনে হয় কোন বিপদের আশঙ্কা আছে। তাই আমি আজ ওঁর সহচারিণী হতে চাই। আপনারা আমাকে অনুমতি দিন।

পুত্রবধূর কাতর প্রার্থনায় চিত্ত দয়ার্দ্র হলো বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর। তাঁরা একবাক্যে জানালেন, বেশ, যেতে পারো। তোমার যাত্রা সফল হোক।

সাবিত্রী ভক্তিনম্রভাবে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম নিবেদন

করলো। তারপর আনন্দিত মনে যাত্রা করলো, স্বামীর পথসঙ্গিনী-রূপে।

বাইরে মুখাবয়বে আনন্দের হাসি তার সুন্দর রূপের মাঝে এনে দিয়েছে সুন্দরতর রূপের জ্যোতি। তবু তার অন্তরে নেই সুখ। আসন্ন স্বামীমৃত্যুর আশঙ্কা তাকে করে তুলেছে ভগ্নোৎসাহ—তার হৃদয় ব্যথিত এবং ভাবি পতি-বিচ্ছেদবেদনায় মথিত।

ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে চলেছে সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে। সত্যবান আগে আগে চলেছে, সতীসাধ্বী পত্নী তার পিছন পিছন চলেছে।

হঠাৎ সত্যবান বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে পত্নীকে বললে, প্রিয়ে সাবিত্রী, আমার মাথা ঘুরছে। আমার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন বোধ হচ্ছে। আমার সর্বশরীর যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত। আমি কিছুকাল তোমার পাশে বিশ্রাম করবো।

স্বামীর কথা শুনে সাবিত্রী ভয়জড়িত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, প্রভো! আপনি আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করুন।

স্ত্রীর কথা শোনামাত্র সত্যবান তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস উপস্থিত হলো। পরে দেহত্যাগ করলো সত্যবান।

সাবিত্রী অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বসে রইলো পতির মৃতদেহ আগলে। কিছুক্ষণ পরে যমদূতেরা সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করবার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু সাবিত্রী যেখানে পতির মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল তার চারপাশে অগ্নিবলয় ধকধক করে জ্বলতে লাগলো। তাই দেখে তারা ভয়ে আর অগ্রসর হতে সাহস করলো না। তারা চলে গেল যমরাজার কাছে। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলো। তাদের কথা শুনে যমরাজ বললেন, তোমরা অপদার্থ। তোমরা ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারলে না। চলো আমি নিজে যাচ্ছি।

এই বলে যমরাজ সদলবলে চলে এলেন সতীসাধ্বী সাবিত্রীর কাছে। এসে দেখলেন, পতিপ্রাণা সাবিত্রীর দু'নয়ন হতে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হচ্ছে। সে মৃত পতির দেহ কোলে নিয়ে বসে আছে। তার চারপাশে জ্বলছে অগ্নিবলয়। যদিও যমরাজের ক্ষমতা অসীম তথাপি তিনি ঐ অগ্নিবলয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেন না। তার কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শান্তস্বরে বললেন, মা, তুমি এই শবদেহ পরিত্যাগ করো। কারণ, জেনো মর্ত্যবাসী মাত্রকেই দেহত্যাগ করতে হয়। এইটেই বিধির বিধান। মর্ত্যবাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম মরেছি। তারপর থেকে সকলকেই মরতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।

যমরাজের কথা শুনে সাবিত্রী সত্যবানের দেহ ত্যাগ করে কিছু দূরে সরে গেল। এবার যমরাজ সত্যবানের দেহ হতে জীবাত্মাকে বের করে দিলেন। তারপর চলতে লাগলেন নিজের গৃহের দিকে।

সাবিত্রী কিন্তু যমরাজের সঙ্গ ত্যাগ করলো না। সে তার পিছন পিছন চলতে লাগলো এবং যমরাজের কাছে বারংবার কাতর প্রার্থনা জানালো, আমি স্বামীবিরহে বেঁচে থাকতে অক্ষম। আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার স্বামীকে পুনরায় জীবন দান করুন।

এভাবে সাবিত্রী পুনঃপুনঃ যমরাজের কাছে নিজের অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা জানালো। যমরাজও প্রতিবার সাবিত্রীকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলো যে সত্যবানের আত্মাকে প্রত্যর্পণ করা দুঃসাধ্য কর্ম।

অবশেষে পতিপ্রাণা রমণী সাবিত্রীর জয় হলো। তার একান্ত প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে যমরাজ সত্যবানের মহান্ প্রাণ পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন এবং সেইসঙ্গে আশীর্বাদ জানালেন, তোমার স্বামী দীর্ঘায়ু লাভ করে বহু সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার প্রতিপালন করুক।

স্বামীর কাছে এসে তাকে পুনরায় জীবন্ত দেখে সাবিত্রীর মনে আনন্দ জাগলো। সে তখন ফিরে এলো আশ্রমকুটিরে স্বামীকে নিয়ে। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিয়ে শান্তিতে ঘরসংসার করতে লাগলো।

এর পর রাসমণি পুরাণের গল্প শোনে। ধ্রুব-প্রহ্লাদের গল্প তার কাছে খুব ভাল লাগে।

হরেকৃষ্ণ বললেন ধ্রুবের কাহিনী,—

স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁর দুই পুত্র, প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ।

উত্তানপাদ রাজার দুই রাণী। সুনীতি আর সুরুচি।

রাজা উত্তানপাদ সুনীতিকে বেশি ভালবাসতেন না। সুরুচি ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা মহিষী। সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে একটি পুত্র। তার নাম উত্তম।

রাণী সুনীতিও যথাসময়ে এক সুন্দর শরীর-বিশিষ্ট পুত্রের জননী হন। এই পুত্রই আমাদের প্রিয়তম ভক্ত ধ্রুব।

দু'জনে শশীকলার মত বাড়তে থাকে। ক্রমে তারা পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে ছ'য়ের কোঠায় পা দিলো।

দু'জনের বিদ্যাচর্চা একই সঙ্গে শুরু হলো। দু'জনে একসঙ্গে যেত বিদ্যামন্দিরে।

রাজা উত্তানপাদ কিন্তু উত্তমকে অধিকতর স্নেহ করতেন। তাকে প্রায়ই নানারকম ভাল ভাল জিনিস উপহার দিতেন। অধিকক্ষণ কোলের ওপর নিয়ে বসে থাকতেন।

পুত্র ধ্রুব নিকটে এলে তাকে বিশেষ আমল দিতেন না।

ধ্রুব কিন্তু পিতার অনাদর বারংবার লক্ষ্য করতে লাগলো।

একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটলো।

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসে আছেন। কোলে রয়েছে উত্তম। রাজা পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহের বাক্য শোনাচ্ছেন।

এমন সময় ধ্রুব এলো পিতার কাছে। সে উত্তমের মত পিতার কোলে ওঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলো। পিতাকে বললে, বাবা! আমিও তোমার কোলে উঠবো।

রাজা কিন্তু ধ্রুবকে আমল দিলেন না। ধ্রুবের কথায় করলেন না কর্ণপাত। তাছাড়া রাণী সুরুচি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজাকে ইশারা করে নিষেধ করে দিলেন।

রাজা রাণীর পরামর্শমত ধ্রুবকে করলেন প্রত্যাখ্যান। কারণ তিনি যদি ধ্রুবকে কোলে তুলে আদর করতে যেতেন তাহলে রাণী সুরুচির হতো মহাক্রোধ। একেই তিনি সুনীতিকে বিষনজরে দেখেন। তার ওপর তাঁর পুত্রকে আদর জানালে তিনি দ্বিগুণ মাত্রায় ক্রুদ্ধ হবেন। এই মহাসত্য অবধারিত হয়ে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে পৈত্রিক স্নেহ ও প্রীতির আলিঙ্গন হতে বঞ্চিত করলেন।

শিশু ধ্রুব কিন্তু বিমাতার কুটিল মনের পরিচয় মনে রাখতো না। সে নাছোড়বান্দা। পিতার কোলে উঠবেই। যেমন করেই হোক। উত্তম উঠেছে আর সে উঠতে পারবে না!

পিতাকে পুনঃপুনঃ কাতর অনুরোধ জানালে, বাবা! আমাকে কোলে নাও। উত্তমকে কোলে নিয়েছ আর আমাকে কোলে নেবে না কেন?

সুরুচি কিন্তু ধ্রুবের অযাচিত আবদার পছন্দ করলেন না। সতীনের ছেলের এ হেন আবদার তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হলো। তিনি কর্কশস্বরে ধ্রুবকে বললেন, ছাখো বাছা, তুমি তো আর আমার সন্তান নও যে সিংহাসনে উঠতে পারবে। তুমি হতভাগা সুনীতির সন্তান। সিংহাসন তোমার জন্য নয়। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম নিতে তবে তুমিও উত্তমের সঙ্গে সিংহাসনে উঠতে পারতে। তোমার যেমন জন্ম তেমনি থাকো। অত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন?

বিমাতার তিরস্কারে ধ্রুব বড় দুঃখিত হলো। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে চলে এলো মাতা সুনীতির কাছে।

সুনীতি তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, বাছা ধ্রুব, অমন করে কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

ধ্রুব বললে, বড়মা আমায় বকেছে। বাবা আমাকে কোলে নেয় নি।

এর পর ধ্রুব একে একে আপন মা'র কাছে সুরুচির সমস্ত কথা জানালে। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে মায়ের কোলে হেঁটমুখে বসে রইলো।

সুনীতি ছেলের কথা শুনে বড় ব্যথা পেলেন। অন্তরের দুঃখ প্রকাশ পেল দু'ধারা অশ্রুতে। তথাপি ছেলের অবস্থা বিবেচনা করে প্রাণপণে চেপে গেলেন সে দুঃখ।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সুনীতি সান্ত্বনা দিলেন ধ্রুবকে, বৎস! সুরুচি ঠিকই বলেছে। তুমি মন্দভাগ্য। তাই বলে তোমার দুঃখ করি করা উচিত নয়। জগতে সকলে কিন্তু রাজৈশ্বর্যের মধ্যে জন্মলাভ করে না। যার যে পরিমাণ অধিকার থাকে বুদ্ধিমান লোক তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। পূর্বজন্মের পুণ্য থাকলে লোকে ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মলাভ করেন। কিন্তু যারা ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মলাভ করে না তারা এই জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করলে সম্পদলাভ করতে পারে। তুমি যদি সুশীল ও ধর্মাত্মা হও আর সকলকে ভালবাস ও সকল প্রাণীর ভাল করবার জন্যে যত্নবান হও তাহলে জল যেমন নীচু জায়গায় গড়িয়ে আসতে বাধ্য হয়, সম্পদসকলও তেমনি অনায়াসে তোমাকে আশ্রয় করবে।

মায়ের কথা শুনে ধ্রুব বললে, মা, তুমি যে উপদেশ দিলে আমি সেইমত আচরণ করতে চেষ্টা করবো। বিমাতা সুরুচি রাজার প্রিয়পাত্রী। আমি তাঁর উদরে জন্মগ্রহণ করি নি। সেই কারণে

আমি রাজসিংহাসনে আরোহণ করার অযোগ্য। একা উত্তমই তার উপযুক্ত। বেশ, তাই হোক। সেই পিতার দেওয়া রাজার আসন লাভ করুক। আমি অন্যের দেওয়া স্থান পেতে ইচ্ছা করি না। আমি নিজের চেষ্টায় এমন স্থান লাভ করবো যা আমার পিতাও লাভ করতে পারেন নি।

এইরূপ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাণী সুনীতি মনে মনে গর্ববোধ করলেন। ধ্রুবকে আদর করে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে চুম্বন দিলেন। বললেন, বাছা, তোমার বাসনা পূর্ণ হোক।

একদিন ধ্রুব একাকী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের সুখৈশ্চর্য ভুলে শহর ছেড়ে চলে এলো গহন বনে। ঐ বনে সাতজন ঋষি বাস করতেন। পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষি গভীর সাধনায় মগ্ন থাকতেন ঐ গহন বনাঞ্চলে। দিনে সামান্য কিছু আহার করতেন। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে নামমাত্র চেষ্টা। আসল শক্তি নিয়োগ করতেন ঈশ্বরের ধ্যান, আরাধনা এবং সাধনায়।

ধ্রুব ঋষিদের দেখে স্বভক্তি প্রণাম নিবেদন করলো।

ঋষিগণ তাকে দেখে বললেন, বৎস! তুমি রাজপুত্র। একাকী এই গহন বনে কেন এসেছ?

ধ্রুব তখন বললে বিমাতার ভৎসনা-প্রসঙ্গ।

ঐ কাহিনী বলার সময় ধ্রুবের মধ্যে যুগপৎ বিনয়সহ তেজ ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় পেয়ে আহ্লাদিত হলেন ঋষিগণ। বালক ধ্রুবকে বললেন বৎস! তোমার কি চাই বলো? আমরা তোমাকে তাই দিতে পারবো। তুমি কিরূপ ধনৈশ্বর্য চাও বলো। আমরা তাই তোমাকে দেবো।

ধ্রুব বললে, হে মহর্ষিগণ! আমি অর্থ বা রাজ্যের প্রত্যাশী নই। আমি একমাত্র সেই স্থান চাই যা পূর্বে আর কেউ ভোগ করেন নি। সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান কি করলে আমি পেতে পারবো আমাকে তারই উপায় বলে দিন। আপনারা দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

ঋষিগণ বালক ধ্রুবের অন্তরে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে অবাক্ হলেন। মহা আনন্দিত হয়ে বললেন ধ্রুবকে, বৎস! তোমার কথা শুনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তুমি যদি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করো তবে যিনি পরম ব্রহ্ম, সমস্ত স্থান যাঁর অন্তর্গত, যাঁকে তুষ্ট করলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না সেই হরিকে তুমি আরাধনা করো।

এই বলে ঋষিগণ ধ্রুবকে হরিপূজার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

ঋষিদের কাছ থেকে হরিপূজার পদ্ধতি শিখে নিয়ে ধ্রুব এলো যমুনার তীরে। মধুবন নামে একটি সুন্দর ও নির্জন স্থানে বসে দিনের পর দিন হরিনামরসে তন্ময় চিত্ত হয়ে উঠলো। ধ্রুবের মনে কেবল ঐ এক চিন্তা, কিভাবে সে দেখতে পাবে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দর্শন।

মধুবনের নয়নানন্দকর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভক্ত ধ্রুব দিনের পর দিন হরিনাম জপে মগ্ন হয়। যাকে সামনে দেখে তাকেই প্রশ্ন করে, হ্যাঁগা, তুমি কি পদ্মপলাশ হরিকে দেখেছো?

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলে, না।

একদিন দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখে ধ্রুব বললে, আপনি কি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি?

নারদ বললেন, না। তবে তিনি অচিরে আসবেন। তুমি

এখন দীক্ষা নিয়ে তাঁর নাম করো। তাতে করে পাবে মুক্তি ও আনন্দ।

ধ্রুব বললে, আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। আমি ঋষিদের কাছ থেকে দীক্ষা নিই নি। কেবলমাত্র হরিপূজার পদ্ধতি শিখেছি।

বিনয় বচনে নারদ বললেন, তথাস্তু।

তারপর বললেন, আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে পারি তবে এক সর্ত আছে।

—কি সেই সর্ত? প্রশ্ন করলো ধ্রুব।

তুমি বিমাতার ওপর ক্রোধ কোরো না। তাহলেই তোমার ধর্মের পথ সুগম হবে।

ধ্রুব বললে, আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে তাঁর সুমতি হয়।

এর পর ধ্রুবকে দীক্ষা দেন নারদ। ধ্রুব সেই নাম জপ করতে লাগলো নিভৃত বনাঞ্চলে।

তার তপস্যার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করে দেবরাজ ইন্দ্র বড় বিচলিত হলেন। ভাবলেন, ধ্রুব বোধ হয় স্বর্গরাজ্য লাভের আশায় এমন কঠোর তপস্যায় বসেছে। কিংবা হয়তো সে হতে চায় দেবতা। নচেৎ তার এমন গভীর সাধনার পশ্চাতে কোন্ হেতু থাকতে পারে?

মনে মনে এমন চিন্তা করে মহেন্দ্র একটি অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করলেন।

ভক্ত ধ্রুবের তপস্যা নস্যাৎ করার অভিপ্রায়ে তিনি জনৈক দেবতাকে বললেন, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তুমি অবিলম্বে সুনীতির রূপ ধারণ করে ধ্রুবের কাছে যাও। ছলে-বলে তার ধ্যান ভঙ্গ করো। নচেৎ তোমার বা তোমাদের সঙ্গে আমারও সর্বনাশ ঘটবে। স্বর্গরাজ্য যাবে রসাতলে।

দেবরাজ ইন্দ্রের কথামত ঐ দেবতা সুনীতির বেশ ধরে এলেন

ভক্ত ধ্রুবের কাছে। ধ্রুবকে মধুর স্বরে সম্বোধন করে ক্রন্দনাকুলকণ্ঠে বললেন, বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তুমি আমার অঞ্চলের নিধি। তুমি এই অভাগিনীর সান্ত্বনা। আমার কোন্ দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করে এই ভয়ানক বনে এসেছ? তোমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এখন তো তোমার খেলা করবার বয়স। এর পর লেখাপড়া করে বড় হলে সর্বশেষে তপস্যা করবার সময়। পুত্র! তুমি তপস্যা ত্যাগ করে বাড়ি চলে যাও। যদি তুমি আমার কথামত কাজ না করো তাহলে আমি তোমার সামনে আত্মহত্যা করবো।

ভক্ত ধ্রুব হরিনামের অমৃতে তন্ময় হয়ে গেছে। মায়াবিনী দেবতার কথা তার কানে গেল না। আগের মত গভীর সাধনায় মনোসংযোগ করলো।

এদিকে দেবেন্দ্র উর্ধ্বে আকাশমার্গ থেকে সবকিছু লক্ষ্য করছেন।

ধ্রুবের মধ্যে অনড় ভাব দেখে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি ইশারায় পুনরায় জানালেন দেবতাটিকে, ওহে, আরও অন্যভাবে ছলচাতুরী করো যাতে ওর তপোভঙ্গ হয়।

দেবতা ঘাড় নেড়ে ইন্দ্রকে জানালো, তথাস্তু।

এবার শুরু হলো নব অভিনয়ের পালা। তপস্যাভঙ্গের সুকৌশল অনুষ্ঠান।

মায়াবিনী সুনীতি চীৎকার করে উঠলো, বৎস! বৎস!! ভীষণ বনে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসকল অস্ত্র নিয়ে কাটতে আসছে। পালাও বাবা। পালিয়ে এসো।

এবারও ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ হলো না। দেবতাগণ বড় বিচলিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজের মনেও জ্বলে উঠলো অশান্তির দাবানল।

দেবরাজ অন্যান্য দেবতাদের বললেন অন্য উপায়ে ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ করতে।

দেবতারা রাজী হলো।

কেউ এলো উটমুখো রাক্ষসের রূপ ধরে, কেউ বানরমুখো, কেউ বা সিংহমুখো।

সেই রাক্ষসদের মুখ থেকে লকলক করে আগুন বেরুতে লাগলো। কিন্তু তাতেও ধ্রুবের শরীরে উত্তাপ লাগলো না।

পরে তারা অস্ত্র নিয়ে নানারকম খেলা আরম্ভ করলো। ধ্রুবের আশপাশে নিক্ষেপ করতে লাগলো সেইসব অস্ত্র।

ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ হলো না।

এবার দেবতাগণসহ ইন্দ্র এলেন ভগবান হরির কাছে। কাতর-স্বরে বললেন, দেব, আপনি আমাদের বাঁচান। আপনি অন্তর্যামী। নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন আমাদের মনোবাসনা। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

লোকপালক শ্রীহরি দেবতাদের কথায় হাসলেন মাত্র। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আমি সব জানি। ভক্ত ধ্রুব কারও শত্রু নয়। সে দেবতা হতেও চায় না। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। ধ্রুব আমাকে চায়। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবো।

দেবতারা হরির কথায় মনে বল পেলো। তারা দেবেন্দ্রর সঙ্গে ঘরে ফিরে গেল।

ধ্রুব কিন্তু সমানে গভীর ধ্যান করে চলেছে শ্রীহরির। তার মন সর্বদা শ্রীহরির চরণে সমাহিত।

দিন যায়। ভক্ত ধ্রুবের সাধনার উন্নতিও দেখা দেয়। বহু

বাধাবিঘ্নর উত্তাল সমুদ্রবক্ষ পাড়ি দিয়ে এখন এসেছে সে শান্ত কূলে।

একদিন তার আরাধ্য দেবতা তার সামনে এসে আবির্ভূত হলেন। বিচলিত স্নেহসুধায় মাখানো ভাষায় বললেন ভক্ত ধ্রুবকে, বৎস! আমি তোমার তপস্যা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো। কি চাও বলো?

বালক ধ্রুব আরাধ্য দেবতাকে দেখে পরম আনন্দিত হলো। বাষ্পবিস্ফারিত লোচনে হরিকে বারংবার প্রণতি জানিয়ে বললে, ভগবান! আমি মূর্খ। লেখাপড়া জানি না। আর যে লেখাপড়া না শেখে সে কিছুই জানতে পারে না। আমি কেমন করে তোমার স্তব করবো জানি না।

যদি বর দিতে চাও তবে দয়া করে এই বর দাও যেন আমি তোমার স্তব করতে পারি।

ভগবান হরি ধ্রুবের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। নিজের করস্থিত শঙ্খ দিয়ে ভক্ত ধ্রুবের শরীর স্পর্শ করলেন। এভাবে জ্ঞান দিলেন ধ্রুবকে।

ধ্রুব এবার স্তব করতে শুরু করলো। বললে, তুমি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও ভূতাদি রূপে অবস্থান করছো। তোমাকে নমস্কার।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ ধরে স্তব করার পর করযোড়ে বললে ধ্রুব, হে প্রভু! তুমি তো সকলের হৃদয়ের মধ্যে থাকো। তাই তুমি সকলের মনের কথা ঠিক ঠিক জানতে পারো। তুমি অন্তর্যামী। আমার যা ইচ্ছে ছিল তা তুমি সফল করেছ। হে প্রভু! তোমার যে দেখা পেলুম তাতেই আমার তপস্যা সার্থক হয়েছে। আর আমি কিছুই চাই না।

ভগবান সন্তুষ্ট হলেন ভক্তের কথা শুনে। ভক্ত যে তাঁর প্রাণ।

তিনি ধ্রুবকে বললেন, ধ্রুব, আমি তোমার কথা শুনে বড় আনন্দিত হয়েছি। তোমার তপস্যা আমার দর্শনেই সফল হয়েছে। এখন তোমার আর যা অভিলাষ সেই বর প্রার্থনা করো।

ধ্রুব বললে, তুমি ভগবান। তুমি সকলেরই হৃদয়ে রয়েছ। আমার মনের যা বাসনা তা তুমি জানতে পারছো। আমি বিমাতার কথায় ব্যথিত হয়ে অক্ষয় শ্রেষ্ঠস্থান কামনা করেছিলুম। এখন তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমার আর কোনো বাসনা নেই।

করুণাময় মধুসূদন বললেন, ভক্ত ধ্রুব! তুমি আমার পরম প্রিয়। তুমি আমার পরম ভক্ত। তুমি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবে। তুমি আমার প্রসাদে সকল গ্রহ ও তারার প্রধান এবং সকলের লক্ষ্য হবে। সবার ওপরে সপ্তর্ষির স্থান। তোমার স্থান তাদেরও ওপরে আমি নির্দেশ করলুম। তুমি প্রলয়কাল পর্যন্ত আকাশে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে।

শ্রীহরি পুনরায় বললেন, তোমার জননী সুনীতি অত্যন্ত ধার্মিকা ও সুশীলা। তিনিও তারকা হয়ে তোমার কাছে চিরকাল থাকবেন।

ভক্ত ধ্রুবকে এমন সুন্দর ও সত্য আশ্বাসবাণী শুনিয়ে করুণা-নিদান শ্রীহরি অন্তর্ধান করলেন।

ধ্রুব করযোড়ে শ্রীহরির অসীম দয়া উপলব্ধি করে মনে মনে প্রণাম জানালো। তারপর ফিরে এলো তার পুণ্যশীলা ও স্নেহময়ী জননীর কোলে।

এমনিভাবে রাসমণি গল্প শুনতো তার পিতার কোলের ওপর বসে, কখনো বা শোওয়া অবস্থায়।

সংসারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না হরেকৃষ্ণের। নগদ পয়সা দিয়ে বাজার থেকে জিনিস সওদা করতে পারতো না বড় একটা। অভাব-

অনটন লেগেই থাকতো। আয় কম ব্যয় বেশি। সংসারটি ত খুব ছোট নয়। তাই সংসারের অভাব মেটাবার জন্যে রামপ্রিয়াকে যেতে হতো এখানে সেখানে। কারও কাছ থেকে কলাটা-মূলোটা যদি সংগ্রহ করা যায়, কারও গাছ থেকে ডুমুর, কারও পুকুর থেকে কলমী শাক বা অন্য শাক।

সঙ্গে একমাত্র আদুরে কন্যা রাসমণি যেত। মা মানা করতেন না। ডুমুরগাছের কাছে গিয়ে রাসমণির বড় আনন্দ হতো। ছোট্ট কচি হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিতো মায়ের সঙ্গে ডুমুর পাড়ার জন্যে। কিন্তু সে নিজে পারতো না পাড়তে। মা একহাতে ডাল ধরে নোয়াতেন আর অন্য হাতে দু'চারটে করে ডুমুর পাড়তেন। রাসমণি কাছেই দাঁড়াতো। মা'র হাত থেকে ডুমুর নিয়ে কোচরে পুড়তো আর আনন্দে লাফাতো।

মাঝে মাঝে নিজে নোয়ানো ডাল থেকে লাফিয়ে গিয়ে দু'চারটে ডুমুর ছিঁড়ে আনতো। ডুমুরের আঠা হাতে লাগলে নাক সিটকাতো। মা'র কাছে এসে বলতো, আমার হাত নোংরা হয়ে গেল। আমি আর আসবো না।

মা ভৎসনার ছলে বলতেন, সামান্য ডুমুরের আঠা লাগলে তোর রূপ যাবে না। ঠিক হয়ে দাঁড়া। আমি ডুমুর পাড়ি। ডুমুরপাড়া হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে তোর হাত ধুয়ে দেবো।

রাসমণি চুপ করতো। ইতিমধ্যে সে ডুমুরপাতা ছিঁড়ে নিজের হাতে আঠা পরিষ্কার করতে লেগে যেত। মা'র নজরে পড়লে সে কাজে বিরত হতো।

মাঝে মাঝে এমন কথাও বলতো, মা, আর ডুমুর পেড়ো না। তাহলে হাত নোংরা হয়ে যাবে।

মা বলতেন, তাহলে ক্ষিদে যাবে কেমন করে? ভাত খাবি কি দিয়ে?

ক্ষিদের কথা চিন্তা করে আর কিছু বলতো না রাসমণি।

প্রায় দিন মায়ের সঙ্গে এসে ডুমুর আর শাক সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতো।

কলমী শাক সংগ্রহ করতেন রামপ্রিয়া। হাঁটু সমান জলে নামতেন। রাসমণির ইচ্ছে হতো জলে নামতে। কিন্তু তিনি তাকে নামতে দিতেন না। সে পুকুরপাড়ে বসে মায়ের তোলা শাক সংগ্রহ করতো। জলে নামবার বায়না ধরলে মা বলতেন, সাবধান, জলে নামলে গায়ে কাদা লাগবে। তখন কিন্তু গা নোংরা হয়ে যাবে। গা নোংরা হবার আশঙ্কায় রাসমণি সতর্ক হয়ে যেত। ভুলতো তার অসম্ভব বায়না।

মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন গিয়ে ডুমুরগাছটি চিনে ফেলেছে রাসমণি। তাই এখন থেকে মায়ের সঙ্গছাড়া সে একাকী যেতে পারে সেখানে। পাড়ার দু'চারজন সঙ্গী থাকলে ত কথাই নেই। তখন মনে ভরসা আসে। আনন্দের আমেজ বোধ করে পুরোমাত্রায়। তবে মায়ের নিষেধ থাকতো, একা কখনো যাবি নে ডুমুরতলায়। সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাবি।

রাসমণিও মায়ের আদেশ কখনো লঙ্ঘন করে নি। একটি করে সহচারিণীকে নিয়ে যেত ডুমুর সংগ্রহ করার জন্যে।

রামপ্রিয়াও তাই দেখে নিশ্চিন্ত হতেন। আপন মনে নির্বিঘ্নে গেরস্থালী কাজে মনোনিবেশ করতেন।

একদিন রাসমণি তার জনৈকা সঙ্গিনীর সঙ্গে এসেছে ডুমুর-তলায়।

ডুমুর সংগ্রহ করছে, এমন সময় তার নজরে পড়লো এক অভিনব দৃশ্য। ডুমুরের ফুল দেখলো সে। এর আগে সে মা-

মাসীদের কাছে শুনেছে, ডুমুরের ফুল সহজে দেখা যায় না। যে দেখতে পায় সে বড় ভাগ্যবান। সে রাজা হয়।

ঐ কথার ওপর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল রাসমণির। সে ফুলটি দেখে আনন্দ অনুভব করলো।

তারপর তার বান্ধবীকে ডেকে বললে, এই আয়—কাছে আয়। একটা সুন্দর জিনিস দেখে যা।

বান্ধবী বললে, কি জিনিস ?

রাসমণি সোহাগভরে বললে, আয় না একবার। এমন জিনিস দেখাব তোকে যা দেখলে তুই রাজা হয়ে যাবি।

বান্ধবী তাই শুনে দৌড়ে চলে এলো রাসমণির কাছে। তার পাশঘেঁষে দাঁড়ালো।

সোৎসাহে বললে, কৈ ? কি জিনিস ? দেখা।

ডুমুরের ফুলটি কিন্তু তখনো দৃষ্টিছাড়া হয় নি রাসমণির। সে বান্ধবীকে কাছে ডেকে নিয়ে হাত দেখিয়ে বললে, ঐ ছাখ্, দেখতে পাচ্ছিস ?

বান্ধবী নিরাশকণ্ঠে বললে, না তো।

রাসমণি বললে, তুই দেখতে পেলি না ? আচ্ছা দাঁড়া, মাকে ডাকি।

এই বলে দৌড়ে চলে এলো বাসায়।

রামপ্রিয়া তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কন্যাকে অমনভাবে আসতে দেখে প্রথমে হতচকিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু কন্যার মুখে আনন্দের স্ফূরণ দেখে তিনি আনন্দিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কিরে রাসমণি ? অতো হাসছিস কেন ? কি হয়েছে ?

মা শীগ্গির চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। ডাগর চোখ দু'টি বড় করে বললে রাসমণি।

মা বললেন, কি জিনিস ?

রাসমণি বললে, চলো না একবার। দেখছি। রামপ্রিয়া কিন্তু কন্যার কথা বিশ্বাস করে এককথায় ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু রাসমণি নাছোড়বান্দা। শেষকালে মায়ের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড ধরে টানাটানি আরম্ভ করলো।

এবার রামপ্রিয়া মৃদু হেসে কন্যার অনুবর্তিনী হলেম। সঙ্গে এলো রাসমণির বান্ধবী।

ওরা সকলে ডুমুরতলায় এলে রাসমণি মাকে কাছে ডেকে বললে, মা ছাখো—ছাখো।

রামপ্রিয়া বললেন, কি দেখবো ?

রাসমণি বললে, ডুমুরের ফুল।

রামপ্রিয়া কন্যার কথা শুনে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, যা! ডুমুরের ফুল কি দেখা যায় !

বালিকা রাসমণি আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর দিয়ে জোর গলায় বললে, হ্যাঁ, দেখা যায়। আমি দেখেছি। তুমিও ছাখো—ঐ যে—ঐ—ঐ—ঐ।

কন্যার মত রামপ্রিয়া দু'চার পা এগিয়ে গাছের দিকে তাকালেন কিন্তু ফুল দেখতে পেলেন না।

তখন তিনি রাসমণিকে শান্ত করে বললেন, তুই রাজরাণী হবি বলে ডুমুরের ফুল দেখেছিস।

বান্ধবীও সেই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বললে, ঠিক ঠিক। রাসমণি কিন্তু দমে গেল না।

সহাস্যে বললে, তোমরা কেমন করে জানলে, আমি রাজরাণী হবো না ?

মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি রাসমণিকে কোলের

কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রেখে বললেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুই যেন রাজরাণী হতে পারিস।

পরবর্তী জীবনে রাণী রাসমণি প্রায়ই এই প্রসঙ্গের কথা তুলতেন।

পিতামাতা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবীয় আচার-বিচার মানতেন। রাসমণির মনে ভাব জাগতো অনুকরণের। সে পিতামাতার মত ঝুলির মধ্যে মালা ঘোরানো অভ্যাস করতো। দেওয়াল থেকে আয়না পেড়ে তার সামনে বসে গোপীমৃত্তিকার তিলক কাটতো।

তার সঙ্গীরা তার ওরকম কাজ দেখে ঠাট্টা করতো। কিন্তু রাসমণি সেসব শুনতো না। আপনার মনে পিতামাতার বৈষ্ণবীয় ক্রিয়া অনুকরণ করতো।

হরেকৃষ্ণের ঘরে খোলকরতাল ছিল। মাঝে মাঝে রাসমণি খোলে চাঁটি মারতো—তার ফলে অপূর্ব শব্দ বেরিয়ে আসতো। কান পেতে শুনতো।

কখনো বা করতাল জোড়া নিয়ে আপন মনে গাইতো, 'ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। নিতাই গৌর রাধাশ্যাম॥'

তার ঐ প্রকার কাণ্ড লক্ষ্য করে পিতামাতা তিরস্কার করতেন না। বরং মনে মনে আনন্দ এবং গর্ব অনুভব করতেন।

একদিন এক বৈষ্ণবী এলো হরেকৃষ্ণের বাড়িতে। রামপ্রিয়া তাকে আদর-যত্ন করে বসতে দিলেন।

রাসমণি কৌতূহলবশে তার দিকে তাকাতে লাগলো। তার অঙ্গে তিলক এবং হাতে ঝুলি দেখে তার অনুকরণের স্পৃহা জাগলো। ঘরে আসবার জন্যে হাত-পা উসখুস করতে লাগলো।

কেননা ঘরে রয়েছে আয়না। আয়না সামনে রেখে তিলক পরবে।

কিন্তু আসা হলো না। বৈষ্ণবী মধুর কণ্ঠে গান ধরেছে। সে গান না শুনে কি পারে রাসমণি!

মায়ের সঙ্গে সেও শুনলো গান।

বৈষ্ণবী গাইল—

'সই কেমনে ধরিব পরাণ
আমার কানু চলে গেল
বৃন্দাবন আজি শ্মশান—'

বৈষ্ণবী আবার গাইল—

আমি সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

কখনো বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী গাইতে থাকে—

'অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম-কৃপা কয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত করিয়া পীরিতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥'

আবার কখনো গায় বৈষ্ণবী—

সখিরে,

চল্ যাই মোর সাধের বৃন্দাবনে

সেখানে আছে রাই-কানাই

দিবানিশি নিত্যলীলায় মেতে

তাঁদের দেখিবারে

চল্ যাই একবার বৃন্দাবনে।

দেহে যদি না সামর্থ্য থাকে

দূরদেশ সেই বৃন্দাবনে যেতে

তবে এমন থাকতে ভয় কিসে তোর

সাধের সেই বৃন্দাবনে ভ্রমিতে—

মন, চল্ যাই বৃন্দাবনে

সখিরে, মনকে নিয়ে চল্ যাই বৃন্দাবনে।

সেখানে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা

নিত্য নবরূপে অপার লীলা

সে লীলা দেখলে পরে

শান্ত হবে চিত্ত তোর

আর কোন দুখ থাকবে না রে,

সখিরে, চল্ যাই মোর সাধের বৃন্দাবনে।

এ বৃন্দাবনে যেতে হলে লাগে প্রেমরত্নধন

সে ধন আছে তোর হৃদয় মাঝে

তাই সঙ্গে নিয়ে চল্ যাই বৃন্দাবনে॥

গান গাওয়া শেষ হলে বৈষ্ণবীর দুচোখ দিয়ে বেয়ে এলো দু' ফোঁটা অশ্রুজল। আঁচল দিয়ে মুছলো।

রামপ্রিয়ার আয়ত চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠলো। তিনি চোখ মুছতে মুছতে ঘরে এলেন। খানিকক্ষণ পরে একটি খুঁচিতে করে

এক খুঁচি চাল নিয়ে বাইরে এলেন। রাসমণির হাতে দিয়ে বললেন, নে, ওকে দে।

রাসমণি ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে মায়ের হাত থেকে খুঁচিটা নিলো। তারপর বৈষ্ণবীর কাছে এসে বললে, নাও। আঁচল পাতো।

বৈষ্ণবী আঁচল পাতলো। রাসমণি খুঁচির সমস্ত চাল ঢেলে দিলো ওর আঁচলে।

বৈষ্ণবী খুশী হয়ে বললে, রাজরাণী হও মা। কৃষ্ণ তোমার ভাল করুন।

রাজরাণীর কথা শোনামাত্র আশার আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলো রাসমণির মুখ। সে বৈষ্ণবীকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, ওগো, তুমি ঠিক বলেছো। আমি রাজরাণীই হবো। আমি যে ডুমুরের ফুল দেখেছি।

মাত্র সাত বছর বয়স রাসমণির। এই বয়সেই তার হাবভাব দেখলে মনে হয়, সে একজন পাকা গিন্নী। পাড়ার গিন্নীবান্নিরা রাসমণিকে ঠাট্টা করে বলতেন, তোর এবার একটা বিয়ে দিতে হবে।

রাসমণি হেসে বলতো, আমি বিয়ে করবো তবে যাকে তাকে নয়, রাজপুত্তুরকে।

পড়শীরা বিদ্রূপ করে বলতেন, হ্যাঁ, রাজপুত্তুরের বড় বয়ে গেছে, তোর মত মেয়ের জন্যে এই জল-জঙ্গলে আসবে!

রাসমণি আত্মপ্রত্যয়বলে বলতে থাকে, হ্যাঁ আসবে। দেখে নিও।

এবার পড়শীরা সমস্বরে হাসতে থাকেন। রাসমণির মাও হাসেন।

এমনিভাবে আনন্দের দিনগুলি কাটতে লাগলো রাসমণির।

কিন্তু বিধি বাম। সংসারে যতটা আনন্দ আছে তার তুলনায় বেশি আছে নিরানন্দ।

রাসমণির বয়স সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। হঠাৎ তার আনন্দে ছেদ টেনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন রামপ্রিয়া।

বালিকা রাসমণি হলো মাতৃহারা। সংসারে তার পিতা হরেকৃষ্ণ ছাড়া আপন বলে আর কেউ রইলো না তার। তবে তার এক পিসীমা এবং কাকীমা তাকে দেখাশোনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে বেশি সময় কাটাতো না রাসমণি। পিতার কাছে অধিককাল থাকতো। পিতার কাছে খাওয়াদাওয়া, পিতার কাছে শোওয়া, পিতার সঙ্গে কাজে বেরিয়ে যাওয়া এসব সে করতো। আর তার মধ্যে খুঁজে পেত আনন্দ—ভুলে যেত মাতৃহারার গভীর বেদনা।

পিতৃস্নেহের পক্ষপুটে দিন দিন বেড়ে উঠলো রাসমণি। ক্রমে সে হলো এগারো বছরের কিশোরী।

এবার পিতা হরেকৃষ্ণ বড় চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, এই তো উপযুক্ত সময় কন্যাকে সুপাত্রস্থ করার। কিন্তু পাত্রের সন্ধান পাবেন কোথায় তাঁর সংসারে আর্থিক অনটন। পয়সা নেই। থাকলে তিনি দেশ-বিদেশে ঘটক পাঠিয়ে পাত্রের সন্ধান আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি কপর্দ্দকশূন্য—দরিদ্র। অথচ মেয়ে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে। এখনি ওকে পাত্রস্থ করতে না পারলে সমাজে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠবে। এখনি সব নানা চিন্তায় মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলো হরেকৃষ্ণের। অবশেষে দয়াময় ঈশ্বরই বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন।

গঙ্গাস্নানে এসেছে রাসমণি। স্নান করে কলসীতে জল ভরতে যাবে এমন সময় তার নজরে পড়লো একটি বজরা। বজরায় গুটিকতক ভদ্রলোক এবং তাঁদের ভৃত্যরা রয়েছেন।

বজরার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাসমণি। এর আগে এমন জিনিস তার নজরে পড়ে নি। কৌতূহলভরে তাকিয়ে রইলো বজরার দিকে। জল ভরা আর হলো না।

ক্রমে বজরাটি ধীরে ধীরে এসে লাগলো ঘাটে। বজরার লোকগুলি সুন্দরী রাসমণির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশি করে তাকালেন রাসমণির দিকে। কি যেন সন্ধান করে ফিরলেন তার সুন্দর রূপের মাঝে। কিশোরী এবং অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্না রাসমণি কিছুই বুঝতে পারলো না। সরলভাবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ সেই ভদ্রলোকটির অনিমেষ দৃষ্টিপানে।

ঐ ভদ্রলোকটিই হলেন রাজচন্দ্র—রাসমণির ভাবী স্বামী।

রাজচন্দ্রের পিতার নাম প্রীতরাম মাড়। ইনি কলকাতা জানবাজারের আদি পুরুষ। অতি শৈশবেই প্রীতরামের পিতা মারা যান। প্রীতরাম তাঁর দুই কনিষ্ঠ সহোদর রামতনু ও কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করেন এবং জানবাজারে চলে আসেন। তখনকার দিনে জানবাজারের বিখ্যাত জমিদার মান্নাদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই মান্নাদের বাড়িতে প্রীতরামের এক পিসীর বিয়ে হয়। তিনিই এই পিতৃমাতৃহীন বালক কয়েকটিকে নিজের কাছে রাখেন। এই সময়ে প্রীতরামের বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। তাঁর ছোট ভাইয়েরা অপোগণ্ড বালক মাত্র। একে পিতৃমাতৃহীন, তায় আবার বিদেশ, পরের বাড়ি। প্রীতরামের অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগলো। কি করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই স্থির করতে পারলেন না। অগত্যা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে ঐ মান্নাদের বাড়িতেই রইলেন। যা-কিছু বাংলা শিখেছিলেন তাতেই একরকম কাজ চলতো। তাতে আবার কলকাতা আসা পর্যন্ত একটু একটু ইংরেজী শিখেছিলেন। তার কারণ ছিলো

ইংরেজের গোরা সৈন্য। তাদের সঙ্গে একটু একটু ইংরেজী কথা বলতে লাগলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে বেশ ইংরেজী শিখে ফেললেন।

বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন প্রীতরাম। অনেকগুলি গোরার সঙ্গে আলাপ হলো দেখে সুযোগ বুঝে একটু একটু দালালী কাজ করতে ও গড়ের সৈন্যদের রেশন যোগাতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারলেন দালালী কাজের মর্মকথা এবং তার মধ্যে বেশ আমেজ অনুভব করলেন। তাই সেই ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। ক্রমে বেশ পসার হলো। এই সময়ে একজন সাহেব কলকাতা থেকে ঢাকায় বদলী হন।

যাবার সময় তিনি প্রীতরামের বুদ্ধির উৎকর্ষতা দেখে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে ঢাকায় যাবে? সেখানে গেলে তোমার অনেক উন্নতি হবে।

প্রীতরাম বললেন, হ্যাঁ যাবো।

প্রীতরাম ঢাকায় এলেন এবং সাহেবের সঙ্গে বেশ কাজ করতে লাগলেন। পরে ঐ সাহেবের অনুগ্রহে তিনি পরিচিত হলেন নাটোরের তদানীন্তন রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে।

নাটোরের রাজাও প্রীতরামের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা দেখে তাঁকে নিজের রাজ্যে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে এই সমস্ত পদে ভারি আয় ছিল। প্রীতরাম কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এলেন কলকাতায়। হাতে টাকা হলে সকলেই আদর করে। তাই প্রীতরাম কলকাতায় আশামাত্র সকলেই তাঁকে আদর করতে লাগলো।

মান্নাদের বাড়িতে যুগল মান্না নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রীতরামের স্বভাব, বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতা দেখে নিজের একাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। এই সময়ে প্রীতরামের

বয়স হবে চব্বিশ বছর। শুভদিনে ও শুভক্ষণে বিয়ে হলো। বিয়ের যৌতুকস্বরূপ জানবাজারের কয়েকটি বাড়ি ও ষোল বিঘে জমি পেলেন।

বিয়ের পর মাত্র দু'বছর ছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। তারপর ঐ স্থান ত্যাগ করে জানবাজারে এসে বসবাস শুরু করলেন। এই সময়ে প্রীতরামের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ পুত্রের নাম হয় হরচন্দ্র। এর কিছুদিন পর কলকাতার 'বরণ' নামে একজন সাহেব সওদাগর একটি হাউস খুললেন। প্রীতরাম ঐ হাউসের মুৎসুদ্দি হলেন। এই পদেই তাঁর বেশি আয় ছিল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিপুল অর্থের মালিক হন। যে সালে অর্থাৎ ১১৯৪ সালে প্রীতরাম মুৎসুদ্দির পদে নিযুক্ত হন সেই সালেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

প্রীতরাম বড় অমায়িক এবং সামাজিক মানুষ ছিলেন। তিনি নাটোর রাজসরকারে বড় কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। তখন তাঁর অনেক বন্ধু হয়। তাঁর সেই বন্ধুত্বের ফল এবার অল্পে অল্পে ফলতে লাগলো। প্রীতরাম নাটোর থেকে ফিরলে সেই পদে যে দেওয়ান অধিষ্ঠিত হন তিনি প্রীতরামের পরম বন্ধু। ১২০৭ সালে নাটোর রাজার অধিকারে কয়েকটি পরগনা লাটে ওঠে। তার মধ্যে সাতোর ও মকিমপুর নামে দু'টি পরগনা তখনকার দেওয়ান প্রীতরামের নামে বেনামী করে রাখেন। পরে সেই দেওয়ান নিজে সাতোর পরগনা নিয়ে জলগণ্ড অনুর্বরা মকিমপুর পরগনা ১৯০০ টাকায় প্রীতরামের কাছে বিক্রী করেন। এই ক্রয় করার আগে প্রীতরামের ঐ পরগনায় যৎসামান্য জমাজমি ছিল। সুতরাং সে পরগনা নেওয়াতে তাঁর বিশেষ সুবিধে হলো। ভালভাবে কাজ হবে বলে নিজের ভাই কালীপ্রসাদকে সেখানে নায়েব করে পাঠান। অচিরে তার থেকে বিশেষ লাভ হতে দেখে ঐ সময়ে কলকাতার

কাছে বেলেঘাটায় ছু'টি আড়ত খুললেন। একটা নুনের অন্যটি বাঁশের। মকিমপুর পরগনা থেকে বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি অনেক জিনিস আসতে লাগলো বলে বাঁশের আড়তে তাঁর বেশি লাভ হতে লাগলো। সেখান থেকে রাশি রাশি বাঁশ জলে ভাসিয়ে আনা হতো। সাধারণত লোকে সেই রাশীকৃত বাঁশকে 'মাড়' বলে থাকে। সেই কারণে প্রীতরাম দাসের নাম 'প্রীতরাম মাড়' হলো। আর তার থেকে তিনি ও তাঁর বংশাবলী 'মাড়' নামে বিখ্যাত হন।

১২০৮ সালে প্রীতরাম অত্যন্ত জাঁকজমক করে চাণক নামে জায়গায় নিজের ছেলে রাজচন্দ্র দাসের প্রথম বিয়ে দেন। ঐ সালে রাজচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে দ্বিতীয়া স্ত্রীও স্বর্গে গেলেন। তখন রাজচন্দ্র স্থির করলেন, আর তিনি বিয়ে করবেন না। এই সময়ে প্রীতরামের বড় ছেলে হরচন্দ্র দাস একমাত্র স্ত্রী রেখে কালগ্রাসে পড়েন। বড় ছেলের শোকে পাগল হলেন প্রীতরাম। তিনি দেখলেন বংশ লোপ হবার উপক্রম! তখন তিনি রাজচন্দ্রের কথার অপেক্ষা না করে দেশ-বিদেশে ঘটক পাঠালেন। ঐ সময়ে রাজচন্দ্রের বয়স বিশ বছর হবে।

কিন্তু নানা স্থান ঘুরে ঘটকেরা উপযুক্ত কন্যার সন্ধান পেল না। তখন প্রীতরাম নিজের বন্ধুদের পাঠালেন পাত্রী অন্বেষণে।

তাঁরা বজরায় করে ঘুরতে ঘুরতে ভাগীরথী তীরে হালিসহরে এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাসমণি ঘাটে জল আনতে গেছলো। তাঁরা রাসমণির রূপ দেখে বিস্মিত হলো। কিশোরী রাসমণি কিন্তু তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো না। নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একজন লোক বলে উঠলো, হ্যাঁগা বাছা, এখানে পাকশাক করে খাবার জায়গা কোথাও পাওয়া যায়?

ঘাটে আর কেহ ছিল না তখন। রাসমণি একা। সে উত্তর দিলো, ওপরে অনেক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। আপনারা যেখানে যাবেন সেখানেই জায়গা পাবেন।

ঐ কথা বলার পর একদণ্ড দাঁড়ালো না রাসমণি। বাড়ি ফেরবার জন্যে এগুলো। জলভরা কলসী কাঁকে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগুতে থাকে। তার গায়ের কাপড় ভিজে গেছে। সদ্যস্নাত কিশোরীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যের জ্যোতি ফুটে উঠেছে।

যে লোকটি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন রাসমণির দিকে। ভাবলেন, এ অঞ্চলে এমন রূপসীও আছে!

বাড়িতে ফিরে এলো রাসমণি।

লোকটির ভাগ্য ভাল। ঘাটে একা একা বেশিক্ষণ কাটাতে হলো না। অন্য একজন লোক এলো স্নান করতে।

স্নানার্থীকে দেখে ভদ্রলোকটি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁগা, বলতে পারো ঐ মেয়েটি কে? কাদের বাড়ির?

স্নানার্থী বললে, ও হরেকৃষ্ণ দাসের মেয়ে। জাতিতে কৈবর্ত।

ইতিমধ্যে বজরা থেকে সকলে ঘাটে নেমে পড়েছেন। অন্য একজন প্রশ্ন করলো, মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছে?

স্নানার্থী বললে, না। তবে ওর বাপ বিয়ের জন্যে খুব চেষ্টা করছে।

ভদ্রলোকেরা এর পর লোকটির কাছ থেকে হরেকৃষ্ণ প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা জেনে নিলেন। তার বাড়ি যাবার রাস্তাও দেখিয়ে দিলো স্নানার্থী। বললে, এখান থেকে সোজা গিয়ে একটু ডাইনে, তারপর বামে দু'হাত গেলেই হরেকৃষ্ণের বাড়ি নজরে পড়বে।

ভদ্রলোকেরা পরস্পর কি যেন বলাবলি করে তারপর স্নানার্থীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

হরেকৃষ্ণের বাড়িতে এসেছেন প্রীতরামের বন্ধুবান্ধবেরা। হরেকৃষ্ণ তাঁদেরকে খুব খাতির করলেন। আদর-আপ্যায়ন করে বাড়িতে বসতে দিলেন। করযোড়ে বিনয় বচনে বললেন, আপনারা শহরের বাবু। পাড়াগাঁয়ে গরীবের কুঠির কি ভাল লাগবে?

ওকথা শুনে প্রীতরামের বন্ধুরা সমস্বরে বললে, ওকথা বলবেন না। আমাদের এ জায়গাটিই স্বর্গ মনে হচ্ছে।

সলজ্জ হাসিতে হরেকৃষ্ণ বললেন, সে আমার সৌভাগ্য।

যথাসময়ে হরেকৃষ্ণ অতিথিদের খাওয়ালেন। তাঁর অভূতপূর্ব আপ্যায়নে এবং মিষ্ট ব্যবহারে অত্যধিক আনন্দিত হলেন প্রীতরামের বন্ধুরা।

ভোজনপর্ব সমাধা হলে সকলে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে লাগলেন। বিশ্রামের সময় কথাপ্রসঙ্গে প্রীতরামের জনৈক বন্ধু বললেন হরেকৃষ্ণকে, শুনলুম আপনি কন্যাদায়গ্রস্ত। আপনি যদি কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেন তবে আমরা একটি সদ্‌পাত্রের সন্ধান দিতে পারি।

সোৎসাহে হরেকৃষ্ণ বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। কোথায় সে পাত্র থাকে? কি তার নাম?

বন্ধুটি বললেন, পাত্রর নাম রাজচন্দ্র। তিনি জানবাজারের বড় ব্যবসায়ী এবং জমিদার প্রীতরামের পুত্র। তিনি বিপত্নীক। পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

তখনকার দিনে এক ব্যক্তি একাধিকবার বিয়ে করতে পারতেন। বিশেষ করে যাঁরা বিপত্নীক তাঁদের বেলায় ত কথাই নেই।

এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন হরেকৃষ্ণ। তাঁর প্রিয়তমা দুলালী রাসমণিকে ডাকলেন।

যথাসময়ে রাসমণি এলো। বেশি সাজগোজ করলো না। কারণ পাত্রপক্ষ তাকে আগেই দেখে নিয়েছেন। সেকথা তাঁরা

হরেকৃষ্ণকে জানালে তিনি খুশী হয়ে রাসমণিকে স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁদের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেন। রাসমণির খুড়ীমা ও পিসীমা প্রথমে সামান্য আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু হরেকৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সে আপত্তি টিকলো না।

সুন্দরী রাসমণিকে দেখে প্রীতরামের বন্ধুরা খুশী হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে এনেছিলেন একটি মোহর। তাই দিয়ে ভাবী বধূর মুখ দেখলেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে, যদি কোন লোক দু'বার বিয়ে করার পর তৃতীয়বার বিয়ে করতে যায় তাহলে তাকে আগে কলাগাছকে বিয়ে করতে হবে।

বিপত্নীক রাজচন্দ্র তাই করলেন। তিনি প্রথমে কলাগাছকে বিয়ে করলেন। তারপর রাসমণির পাণিগ্রহণের বিরাট আয়োজন করলেন। মহা ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল রাসমণির।

রাসমণি সত্যি সুখী হয়েছে। মনের মত ঘর পেয়েছে। তার আবাল্য সাধ ছিল রাজরাণী হবে। এখন সে সাধ মিটলো। বিয়ের পর সে যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে তখন তার পাড়াপড়শীরা তাকে দেখে সহাস্যে বললে, ধন্যি তুই রাসমণি! তুই যেমনটি বলেছিলি তাই হলি।

রাসমণির অত খেয়াল ছিল না। সে অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলো, কি বলেছিলুম? কোন্ কথা?

এক প্রৌঢ়া পড়শিনী তার থুতনি ধরে সামান্য নাড়া দিয়ে বললে, আহা, আর লজ্জা ধরে না সোয়ামীকে দেখে! কি বলেছিলি মনে নেই? তুই না বলেছিলি, তুই ডুমুরের ফুল দেখেছিলি। তাই রাজরাণী হবি। তা এবার তো তোর সাধ মিটলো। সত্যি রাজার সঙ্গে ত বিয়ে হলো!

রাসমণি ফিক করে হেসে ঘোমটার মধ্যে মুখ লুকালো। তার কপালে সোনার টায়রাটা ঝকমকিয়ে উঠলো।

এর পর রাজচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললে পড়শিনী, দেখো বাবা, তোমার রাণীকে সুখে রেখো। ও বড় অভিমানী মেয়ে। তারপর মুখটেপা হাসি হেসে বললে, বাপের একমাত্র মেয়ে কিনা তাই অমনধারা হয়েছে।

এবার বিদায়বেলা এলো। জোড়ে বিদায় নিচ্ছেন রাজচন্দ্র। গুরুজনেরা আশীর্বাদ করলেন, কনিষ্ঠজনেরা প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করলো।

যাবার সময় রাসমণি হরেকৃষ্ণের হাত ধরে কাঁদতে লাগলো। সে কি কান্না! রাজচন্দ্রও বিশেষ অস্বস্তি বোধ করলেন। তাই দেখে হরেকৃষ্ণ রাসমণিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ছি মা! কেঁদো না, কাঁদতে নেই। শুভকাজে এমনধারা কাঁদে না। তোমার কোন কষ্ট হবে না। শ্বশুরবাড়িতে ভালভাবে থাকবে। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

ঐরকম অনেক উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিলেন হরেকৃষ্ণ রাসমণিকে।

রাসমণি অশ্রুভরা নয়নে পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে শেষবারের মত তাকালো। তারপর কম্পিত হাতে ভূমিষ্ঠ হয়ে একটি ছোট প্রণাম সেরে স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসলো।

সমবেত নারীপুরুষ আর একবার হুলুধ্বনি করে উঠলো। সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।

চালক গাড়ী চালাতে শুরু করলো নব বরবধূকে নিয়ে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছে রাসমণি।

স্বামীর সোহাগ আর শাশুড়ীর আদর পাচ্ছে পুরোমাত্রায়। মাঝে মাঝে শ্বশুরের স্নেহও প্রাণভরে উপলব্ধি করে রাসমণি। তাই পিতাকে ছেড়ে থাকার দুঃখ ভুলে যায়।

তিন বছর পরে ১২১৩ সালে একটি কন্যা প্রসব করলো রাসমণি। প্রীতরাম নবজাত কন্যার নাম রাখলেন পদ্মমণি। যেমন নাম তেমনি তার রূপ। এমন রূপ যে তার সঙ্গে পদ্মের তুলনা হয় না। তার চেয়ে বড় একটা কিছু করতে হয়। শেষপর্যন্ত প্রীতরাম ওর নাম দিলেন পদ্মমণি।

কন্যা ও স্বামীর প্রতি রাসমণির ভালবাসা দিন দিন বাড়তে লাগলো। রাজচন্দ্রও রাসমণিকে কাছে পেয়ে সুখী হলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি তৃতীয়বার বিয়েতে সুখী হবেন কেননা দু' দু' বার বিপত্নীক হবার পর পুনর্বার বিয়ের আশা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু গুণান্বিতা স্ত্রী রাসমণির ভালবাসার প্রভাবে পূর্বজীবনের সব স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হলেন।

পিতার কাছে থাকার সময় লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় নি রাসমণি। অথচ লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা প্রবল ছিল তার। স্বামী রাজচন্দ্রও চাইতেন, তাঁর স্ত্রী বিদূষী হবে। তাই স্বামীর কাছে থেকে অনুমতি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলো রাসমণি।

কিন্তু শাশুড়ী আপত্তি জানালেন। বললেন, কুলবধূর আবার ওসব কেন? বৌ কি চাকরি করতে যাবে?

পুত্র রাজচন্দ্র অনেক করে বোঝালে তিনি শান্ত হলেন। রাসমণি বিনাবাধায় পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলো।

পিতাকে অধিক ভালবাসতো রাসমণি। শ্বশুরবাড়িতে থাকলেও

পিতার কথা এমন কি নিজের ভাইদের কথা মনে করতো। মাঝে মাঝে নিজের ভাই ও আত্মীয়দের দেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসতো। স্বামীগৃহে অর্থাভাব ছিল না। সুতরাং এখানে এলে খাওয়া-পরার অভাব হতো না।

দেশবাড়িতে অর্থাভাবের জন্যে অনেক সময় অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে কাটাতে হতো। দয়াশীলা রাসমণির আশ্রয়ে এসে ওরা বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটাতো। পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করে চলে যেত।

একবার পিতা হরেকৃষ্ণ এলেন কলকাতায়। মেয়ের শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা দেখে আনন্দিত হলেন। তখন তাঁর নিজের বৈষয়িক অবস্থা ততো ভাল ছিল না। দারুণ অর্থাভাব। তাই তিনি একদিন প্রিয়তমা কন্যা রাসমণিকে চুপি চুপি জানালেন, আমার নিদারুণ অর্থাভাব। এখানে যদি কিছুদিন থাকতে দিস তবে ভাল হয়।

রাসমণি বললে, তা কি করে হয়, বাবা? এ যে তোমার জামাইবাড়ি। এখানে থাকলে লোকে কি বলবে? তোমার মান-সম্মান যে যাবে।

হরেকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন। রাসমণি স্বামীর কাছে পিতার অর্থাভাবের কথা জানালো। রাজচন্দ্র বললেন, তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে আমি সুখী কিন্তু আমার হাতে তো এখন বিষয়ের ভার নেই। বাবা হচ্ছেন তার মালিক। তুমি বরং বাবার কাছে জানাও।

লজ্জাশীলা রাসমণি সোজাসুজি শ্বশুরকে পিতার আর্থিক দুরাবস্থার কথা জানাতে পারলো না। তাই প্রথমে শাশুড়ীর কাছে কথাটি উত্থাপন করলো।

শাশুড়ী পুত্রবধূর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে জানালেন শ্বশুরকে।

শ্বশুর খুশী হয়ে বললেন, বেশ তো, আমি বৌমার বাপের বাড়িতে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পাঠাবো। এ আর এমন কি বড় কথা!

এই বলে তিনি হরেকৃষ্ণকে কিছু আর্থিক সাহায্য পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। পরে স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, বৌমার মত এমন পিতৃভক্ত মেয়ে কোথাও দেখি নি।

এই সময়ে রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। প্রীতরাম তার নাম রাখলেন কুমারী। বাড়ি ছোট বলে স্থান-সংকুলান হলো না। তাই ১২২০ সালে নতুন বাড়ীর পত্তন করেন। বর্তমান বাড়িটি হচ্ছে ঐটি। এর কিছুদিন পরে রামতনু নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

১২২৩ সালে কালীপ্রসাদ দুই পুত্র অভয়চরণ ও উমাচরণকে রেখে মারা যান। পরে ১২২৫ সালে প্রীতরাম মহা আড়ম্বরে সিঁথি নিবাসী রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে নিজের দৌহিত্রী পদ্মমণির বিয়ে দেন।

১২২৪ সালে রাসমণির তৃতীয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হলো। শুভদিনে তার নাম রাখা হলো করুণাময়ী।

পরে ১২২৪ সালে প্রীতরাম আপন পত্নী ও একমাত্র পুত্র রাজচন্দ্র, পুত্রবধূ রাসমণি ও তিনটি দৌহিত্রী ও একটি দৌহিত্রী জামাতা রেখে পরলোকযাত্রা করেন। মরার সময় তিনি প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যান। রাজচন্দ্রের অন্য কোন ভাই না থাকার জন্যে তিনি একাই ঐ অর্থের অধিকারী হন।

রাজচন্দ্র বেশ শিক্ষিত এবং চতুর ব্যক্তি ছিলেন। পিতা জীবিত থাকার সময় থেকেই তিনি কলকাতায় দেশীয় এবং বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশতেন। ইংরেজ বা বাঙালী উভয় জাতীয়

বণিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদ্যতা। তাদের বাড়িতে এমন কি অফিসে গিয়ে দেখা করতেন। তাদের সময়ে অসময়ে অর্থ দিতেন। পিতা মারা গেলে তিনি নতুন ব্যবসা আরম্ভ করলেন। একস্‌চেঞ্জ অন্যান্য সওদাগরদের হাউসে যেতেন ও সুবিধামত দ্রব্যাদি পেলে প্রায় কিনে আনতেন। এভাবে তামার চাদর, কস্তুরা, আফিম, নীল প্রভৃতি নানারকম জিনিস বিলেতে পাঠাতেন। বিলেতে কল্‌বিন্ কাউই এণ্ড কোং নামে তাঁর এজেন্ট ছিল।

এই সমস্ত বিষয়ে রাজচন্দ্র প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি প্রতিদিন সকালে স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করে একস্‌চেঞ্জ ও অন্যান্য অফিসে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একস্‌চেঞ্জ অফিসে এসে শুনতে পেলেন তাড়াতাড়ি আফিমের নীলাম হবে। অন্যান্য বণিকেরা সেখানে উপস্থিত হবার আগেই ঘোরতর প্রবল ঝড় ভীষণ মূর্তি ধারণ করে পৃথিবী অন্ধকার করে ফেললো। পথিকেরা আর যেতে পারলো না। ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান বণিকেরা কেউই যথাসময়ে একস্‌চেঞ্জ হাউসে আসতে পারলো না। নীলাম আরম্ভ হলো। সুবিধে বুঝে রাজচন্দ্র সমস্ত আফিম পঁচিশ হাজার টাকায় কিনলেন। কিচ্ছুক্ষণ পরে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মাড়োয়ারী মহাজনেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে শুনলো, একটি বাবু সমস্ত আফিম কিনেছেন।

তখন তারা সকলে রাজচন্দ্রের কাছে এসে সেসব আফিম কিনতে চাইলো।

রাজচন্দ্র বললেন, বেশ, ঐ আফিম আবার নীলামে ওঠানো হোক।

নীলামে উঠলো। ক্রমে দর বেড়ে গেল। এভাবে পঁচিশ হাজার টাকার জিনিসে পঁচাত্তর হাজার টাকা হলো। পঁচিশ

হাজার টাকা খরিদমূল্য বাদে রাজচন্দ্র পঞ্চাশ হাজার টাকা লভ্যাংশ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। রাজচন্দ্রের ভাগ্যদেবী এমনিই ছিল, তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন তা তৎক্ষণাৎ সফল হতো।

তখনকার আমলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী লোকদের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল রাজচন্দ্রের। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ, পাথুরেঘাটার ঠাকুরবংশ রায়-রায়ান গুরুদাস, আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায়, দেওয়ান হৃদয়রাম, জোড়াসাঁকোর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, অক্রূর দত্ত, প্রিন্স দ্বারকানাথ, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং রাজা রাধাকান্ত দেব।

কেবল এঁরাই যে রাজচন্দ্রের প্রিয় বন্ধু ছিলেন তা নয়। বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষেরা রাজচন্দ্রের সঙ্গে হাসিঠাট্টা এবং খানাপিনা করতেন। তখনকার ভারতের বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড রাজচন্দ্রকে নিজের বাসভবনে ডেকে এনে নানারকম গল্পগুজব করে সময় কাটাতেন।

তখনকার দিনে ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ঐ কোম্পানীর একজন অংশীদারের নাম জন বেব। তিনি রাজচন্দ্রকে খুব ভালবাসতেন। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ জন বেব রাজচন্দ্রকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। ঐ ঘড়িটি অদ্যাপি রাজচন্দ্রের বংশধরদের কাছে রয়েছে। সেই ঘড়ির গায়ে লেখা আছে,—

A Token of Esteem
sent by
John Bebb, Esqr. of London
to his friend
Babu Raj Chandra Dass
January, 1826

১২২৬ সালে রাসমণি একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। ১২৩০ সালে তাঁর চতুর্থা কন্যা ভূমিষ্ঠ হলো। রাজচন্দ্র তার নাম রাখলেন জগদম্বা।

ঠিক এই সময়ে রাসমণির পিতা রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। রাসমণি অত্যন্ত শোকান্বিত হয়ে তৃতীয় দিনে মহোৎসবের সঙ্গে আদ্যকৃত্য শেষ করলেন। রাজচন্দ্রের স্নেহ ও ভালবাসায় রাসমণি ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক বিস্মৃতা হন। অশৌচান্তে ঘাটে অবতরণ করেন। কিন্তু গঙ্গার কোলে ভাল স্নানের ঘাট না পাওয়ার জন্যে যাত্রীদের বড় অসুবিধা হতো। রাসমণি নিজেই অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলেন। তাই স্বামীকে বললেন, গঙ্গায় ভাল ঘাট নেই। এখানে একটা বাঁধানো ঘাটের ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না কি? স্বামী রাজচন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। ১২৩৮ সালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে বাবুঘাট তৈরী করালেন। লোককল্যাণে ঐ ঘাট উৎসর্গ করলেন। আর মানুষজনের যাবার সুবিধের জন্যে জানবাজার ষ্ট্রীটের সংলগ্ন গড়ের মাঠের মাঝখান দিয়ে 'বাবুরোড্' নামে একটি বিস্তীর্ণ রাস্তা তৈরী করালেন।

ঐ রাস্তা তৈরী করতে রাজচন্দ্র বিপুল কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করেন। ময়দানের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরী করার জন্যে প্রথমে কালকূটরিতে আবেদন করেন। তারা এ বিষয়ে অস্বীকার করায় দুর্গান্তর্গত গেরিসন মাষ্টারকে জানান ব্যাপারটা। তিনি কোন উত্তর না দেওয়ায় গভর্ণর বাহাদুরের কাছে নিজে গিয়ে প্রকাশ করেন।

তাঁর কথা শুনলেন গভর্ণর বাহাদুর। পরে তিনি অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আদেশ দিলেন। রাজচন্দ্র এ সমস্ত বিষয় নিজের হাতে রাখবার জন্যে সেই জায়গা বিস্তর অর্থ দিয়ে কিনে নিলেন।

বাগবাজারে ছিল প্রীতরামের আড়ত। তার কাছে খাল খনন

করার আয়োজন চললো। রাজচন্দ্র ইংরাজ-সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেন। অবশেষে খাল খনন করা হলো। রাজচন্দ্র নিজে থেকে দিলেন একহাজার মুদ্রা। আর নিজের অধীনের খানিকটা জমিও সেই সঙ্গে দান করলেন। রাণী রাসমণি শুনলেন রাজচন্দ্রের বদান্যতার কাহিনী। শুনে উনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

একদিন কয়েকজন লোক এসে হাজির হলো রাসমণির কাছে। তাদের অসুবিধার কথা পেশ করলো। বললে, খাল তো খোঁড়া হলো কিন্তু পারাপার করার জন্য খেয়া নেই। আপনার দয়ায় যদি খেয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অত্যন্ত ভাল হয়।

রাণী তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাদের কথা রাজাসাহেবকে জানাবো। তোমরা এখন এসো।

লোকগুলি চলে গেল। পরে রাণী রাজার কাছে এসে জানালেন, খাল তো খোঁড়া হলো। পারাপারের কি ব্যবস্থা করলে?

রাজচন্দ্র বললেন, কি ব্যাপার?

রাণী সব কথা খুলে বললেন।

রাজচন্দ্র বললেন, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘোড়া যখন হয়েছে তখন চাবুকের আর ভাবনা কি?

রাজচন্দ্র ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। খেয়ার ব্যবস্থা হলো। তবে সেই সঙ্গে একটি ব্যবস্থা হলো যে যদি কেউ রাসমণির নাম করে খালা পার হতে চায় তবে সে বিনা পয়সায় সে সুবিধে ভোগ করতে পারবে। রাণী সেই কথা শুনে খুশী হলেন।

একদিন স্বামীর সঙ্গে ফিটনে চেপে গঙ্গার তীরে সান্ধ্য ভ্রমণ করছিলেন রাসমণি। অদূরে দেখতে পেলেন নিমতলা শ্মশান। পরে তিনি সেখানে এলেন। স্বচক্ষে দেখলেন শ্মশানের দুরবস্থা। ঘাট নেই, ঘর নেই। শবযাত্রীরা এসে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করে

থাকে। তিনি স্বামীকে সব কথা বললেন। তাঁর কথামত ১২৩২ সালে নিমতলায় একটি সুরম্য ঘাট ও গৃহ তৈরী হলো। আগন্তুকদের সুবিধের জন্যে সেখানে একটি দারোয়ান, একজন চিকিৎসক ও দু' একজন ভৃত্য রেখে দেন।

নিমতলা হয়ে বাগবাজারে এলেন রাসমণি। সেখানে মদন-মোহন ঠাকুরকে দেখলেন। মদনমোহন দেখে আসার পর আহিরীটোলা হয়ে আসছিলেন। সেখানকার মানুষজনের স্নানাদি-ক্রিয়ার অসুবিধা দূর করার জন্যে স্বামীকে বলে একটি ঘাট ও চাঁদনী তৈরী করে দেন।

লর্ড বেন্টিক ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। তাঁর মনে সংস্কারের ভাব প্রকাশ পেল। তিনি এদেশে মার্জিত রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করলেন। তাঁর দরবারে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি—দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি উপস্থিত হন। রাজচন্দ্রও যোগ দিলেন। সভায় প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল সতীদাহ-প্রথার বিলোপসাধন। ঐ প্রথার বিপক্ষে সকলে একমত হয়ে ঐ প্রথা রোধকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করতে সম্মত হলেন।

বড়লাটের দরবার থেকে বেড়িয়ে এসে রাজা রাজচন্দ্র রাণী রাসমণির কাছে এসে সমস্ত বিষয়টি জানালেন। কৌতুক করে বললেন, আমি মরে গেলে তুমি আর সহমরণে যেতে পারবে না।

রাণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, কি ব্যাপার? রাজচন্দ্র বললেন, সতীদাহ-প্রথার লোপ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাণী বললেন, তাতে আমারও মত আছে। তবু আমাদের দেশের মেয়েরা অবলা। তাদের দুঃখের শেষ নেই। তাদের দুঃখ দূর করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে বিধবা অবস্থায় তারা অন্যের কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করে।

রাজা রাজচন্দ্র বললেন, তারও ব্যবস্থা হবে। সবই ঈশ্বরের বিধান। একটা নতুন কাজ হলে তার সঙ্গে আরও পাঁচটা নতুন সঙ্কেত থাকে।

রাণী হেসে নীরব হলেন। স্বামীর কথায় আশা পোষণ করতে লাগলেন মনের কোণে।

এর অনেকদিন পরে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ নিয়ে আন্দোলন চললো সারা দেশে। তিনি রাজসরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে বিধবাবিবাহ আইনের প্রচলন করেন।

রাণী রাসমণি ঐ কথা শুনে আনন্দিত হলেন। সতীদাহ-প্রথা নিরোধকল্পে এতদিন বিধবারা সমাজে থেকে যে নির্য্যাতন ভোগ করছিল এবার তার অবসান হবে এই আশায় তার অন্তর তৃপ্তির নিশ্বাসে ভরপূর হয়ে উঠলো। তিনি বিদ্যাসাগরের লেখা বিধবা-বিবাহপ্রসঙ্গে বিভিন্ন পুস্তক ক্রয় করে কুলপুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে পাঠ করাতে লাগলেন এবং পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, শাস্ত্রে যখন বিধবাবিয়ের বিধি আছে তখন লোকে তা করে না কেন? পুরোহিত তাঁকে ঠিক বোঝাতে পারলো না।

বিদ্যাসাগরের ওপর রাণীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে উঠলো। তাঁর লেখা বই 'বিধবাবিবাহের উপসংহার' এবং 'বহু বিবাহে'র অনেকাংশের পাঠ শুনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। অবলা বঙ্গ-ললনাদের দুঃখ তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করতো। এমনি সুন্দর এবং সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর ছিল রাণী রাসমণির।

লর্ড বেন্টিক প্রজাপুঞ্জের সামাজিক উন্নতির জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহানুভূতি আর সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠলো হিন্দু কলেজ। প্রথমে দশ-বারোটি ছাত্র নিয়ে ঐ কলেজ চালু করা হলো। আর ঐ দশ-বারোটি ছাত্রের থাকাখাওয়ার ভার নিলেন স্বয়ং রাজচন্দ্র। শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং দুস্থদের প্রতি তাঁর বদান্যতার পরিচয় পেয়ে সহৃদয় দেশবাসী তাঁকে সাধুবাদ জানাতে ভোলে নি।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রাজচন্দ্র তাঁর জমিদারী থেকে কিছু নগদ অর্থ দান করেছিলেন।

১২৪০ সালে এদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। রাজচন্দ্র নিজে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং পত্নী রাসমণির পরামর্শমত নিপীড়িতদের কিছু সাহায্য দেন। লর্ড বেন্টিক রাজচন্দ্রের মহৎ গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে 'রায়' উপাধি দেন।

রাজচন্দ্র নিজে অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি ইংরেজ শিক্ষক রেখে ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশীয় বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী হন।

তাঁর চরিত্রে একটি মহৎ গুণ ছিল এই যে, তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে বিশ্বাস করতেন।

তিনি নিজে যেমন ইংরেজ মহাজনের নিকট হতে টাকা কর্জ নিতেন তেমনি ইংরেজ মহাজনও তাঁর কাছ থেকে টাকা কর্জ নিতেন।

একবার একজন ইংরেজ মহাজন তাঁর কাছে এসে জানালো, আপনি আমাকে আশি হাজার টাকা ধার দিতে পারেন? আমার ব্যবসায় এখন মন্দা অবস্থা। সুদিন এলে আমি আপনার টাকা সুদে-আসলে ফেরত দেবো।

দয়াবান রাজচন্দ্র এককথায় রাজী হয়ে গেলেন। সোৎসাহে

জানালেন, অমুক দিন আসবেন। এসে আপনার টাকা নিয়ে যাবেন।

ইংরেজ বণিক রাজচন্দ্রের কথা শুনে আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে তিনি জনান্তিকে জানলেন, ঐ ইংরেজ বণিক সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গেছে।

কিন্তু কি করবেন আর। উপায় নেই। কথা যখন দিয়ে ফেলেছেন তখন তার এতটুকু নড়চড় হবার যো নেই।

ইংরেজ বণিককে যথাসময়ে আশি হাজার টাকা দিলেন। পরে ইংরেজ বণিক তাকে ঐ অর্থ ফিরিয়ে দেন।

দীর্ঘ আট বছর রাজত্ব করার পর লর্ড বেন্টিক বিদায় নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন লর্ড মেটকাফ্। তাঁর সঙ্গে রাজচন্দ্রের আলাপ হলো।

মেটকাফ্ সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেন এবং অতিশয় উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধারণ পুস্তকাগার সংস্থাপিত করে নিজের নামানুসারে তার নাম 'মেটকাফ্ হল' রাখলেন। এই মেটকাফ্ হলে যে পুস্তকাগার স্থাপিত হলো তাতে রাজচন্দ্র প্রদান করলেন পাঁচ হাজার টাকা।

তিনি ঐ টাকা দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেন যে, আমি বা আমার উত্তরাধিকারীরা যে কেউ হোক না কেন এই পুস্তকাগার হতে বিনামূল্যে পুস্তক পাঠ করতে পারবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা কেউই তার প্রতি মনোযোগ না করায় সেই স্বত্ব হতে বঞ্চিত হলেন।

১২৪৩ সাল। এই সালে বাংলার ভাগ্যাকাশে দেখা দিলো দুর্যোগের ঘনঘটা। দানবীর রাজচন্দ্র মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে

দেহত্যাগ করলেন। তিন কন্যা, তিন জামাতা ও চার-পাঁচ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রেখে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তিনি তৃতীয় জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের বুদ্ধিমত্তা ও সদ্‌গুণ দেখে ১২৩৯ সালে আপনার চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। মৃত্যুসময়ে তিনি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাজ রেখে যান। এছাড়া অনেকগুলি পরগনা কেনেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী রাসমণি অত্যন্ত মুসকিলে পড়লেন। ভাবলেন, এই অতুল ঐশ্বর্যের ভার কার হাতে দেবেন? কে একে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে? অনেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন। একজন বললে, মাস্‌মাহিনা দিয়ে উপযুক্ত ম্যানেজার নিযুক্ত করুন। তিনি আপনার বিষয়-সম্পত্তি নিখুঁতভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

রাসমণি কিন্তু কারও পরামর্শ শুনলেন না। সাময়িকভাবে নিজের চিন্তায় অটল রইলেন। বললেন, আমি ম্যানেজার রাখবো না। আমার তিনজন উপযুক্ত জামাই রয়েছে। তারা আমার বিষয় দেখবে।

তাঁর এই প্রস্তাব শুনে সকলে নীরব রইলো। আর কোন কথা বললো না। ইতিমধ্যে রাণী পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে স্বামীর শ্রাদ্ধ করলেন। দেড়মাস পরে তিনজন জামাতাকে আহ্বান করে বিষয়-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন এবং বললেন, ম্যানেজার না রেখে তোমরা যদি বিষয়-আশয় দেখ তো ভাল হয়। জামাইরা মত দিলো। বললে, হ্যাঁ, আমরা দেখবো। আপনাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না।

কিন্তু তবু রাসমণির মনে ভাবনা এলো। তার পেছনে অন্য একটা কারণ ছিল। কারণটি এই, রাজচন্দ্রের সঙ্গে সখ্যতা ছিল

দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে একবার দেড় লক্ষ টাকা ধার দেন। তাঁর জীবদ্দশায় দ্বারকানাথ তাঁকে সে অর্থ ফিরিয়ে দেন নি। অথচ তিনি রাসমণির জমিদারীতে ম্যানেজার হতে চাইছেন। নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।

বুদ্ধিমতী রাসমণির বড় সন্দেহ হলো। চতুর দ্বারকানাথের ওপর মনে মনে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। একদিন তিনি দ্বারকানাথকে বললেন, আমার স্বামী আপনাকে যে দেড় লক্ষ টাকা কর্জ দিয়েছিলেন আপনি তা ফিরিয়ে দিন। তারপর আমি ঠিক করবো আপনাকে আমার ষ্টেটের ম্যানেজার করবো কিনা।

এতে প্রমাদ গুণলেন দ্বারকানাথ। মনে মনে ভাবলেন রাণী তো সাধারণ মেয়েছেলে নয়! তিনি রাণীকে পিসী বলে ডাকতেন। তাঁর প্রতি ভক্তিও ছিল প্রগাঢ়। কিন্তু টাকার কথা উঠতে সেসব ভক্তি নিমেষে উবে গেল।

পরে তিনি রাসমণিকে সমস্ত অর্থ পরিশোধ করে দেন। কিন্তু ম্যানেজারী করতে পেলেন না। রাণীর জামাইরা বিষয় দেখতে লাগলেন। ফলে দ্বারকানাথ হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। তাই দেখে তখনকার দিনে সমাজে গন্যমান্য ব্যক্তি এবং লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ঠাট্টা করে রাণী রাসমণিকে 'টেপীপিসী' ও দ্বারকানাথকে 'টক্‌চাচা' বলে ডাকতে লাগলেন।

অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও ধর্মকর্ম বা সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে উদাসীন হলেন না রাসমণি। একবার খুব ধুমধাম করে রাসোৎসব করলেন। তাঁর ধারণা যাগ-যজ্ঞাদিতে অর্থ ব্যয় করলে ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার মঙ্গল হবে। সেই কারণে তিনি পরোপকার, অতিথিসেবা, দেবপূজা প্রভৃতি সদ্‌কর্মে মনোনিবেশ

করলেন। প্রতিবছর রাস উপলক্ষে তিনি বিশ হাজার টাকা ব্যয় করতেন।

এর পর রথোৎসবের আয়োজন করলেন। ১২৪৫ সালে মহা ধুমধাম করে রথোৎসব উদ্‌যাপিত হলো। রূপোর রথ করালেন। একদিন জামাইদের ডেকে বললেন, আমি সামান্য কাঠের রথ তৈরী করবো না। অন্যান্য লোকে যা করে নি, তাই করবো। বেঁচে থেকে ধর্মকর্ম যা করতে পারি তাই ভাল। অতএব একখানা রূপোর রথ নির্মাণ করতে উদ্যোগী হও।

রাসমণির কথামত জামাতারা রূপোর রথ তৈরী করাবার জন্যে উপযুক্ত কারিগরের সন্ধান করতে লাগলেন। তখনকার দিনে কলকাতা অঞ্চলে নামজাদা স্বর্ণকার এবং হীরামুক্তা-ব্যবসায়ী হ্যামিলটন কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া হলো রথের জন্যে রূপোর পাত তৈরী করতে।

রাণী রাসমণি শুনলেন সেই সংবাদ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন মনের ইচ্ছা। বললেন, বিদেশীয় ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের দেশে কি স্বর্ণকার নেই? তারা কি পারে না? আমাদের দেশীয়দের হাতে সেই কাজ দাও। দেশীয়দের দিয়ে এটি তৈরী করালে তারা বড় উপকৃত হবে।

রাণীর কথামত ভবানীপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে স্বর্ণকারদের নিয়ে আসা হলো। তাড়াতাড়ি রথ তৈরী হলো।

১২৪৫ সালে মহাধুমধাম করে রথোৎসব সম্পন্ন হলো। সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত তাঁর দায়াদরা উপযুক্ত জাঁকজমক করে রথোৎসব সম্পন্ন করেন। কলকাতার রাজপথে রূপোর রথ বেরোয়। শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দর্শকদের সমাগম হয়।

রাণী রাসমণি নিজে শিবভক্ত ছিলেন ; কিন্তু পিতৃপিতামহদের মান্যার্থে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বড় বড় উৎসব করতেন।

এখন তিনি স্থির করলেন ঝুলনযাত্রা করবেন। ঝুলনের সময় খুব ব্যয় করতেন। এক রাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইউরোপীয়-দের নিমন্ত্রণ করতেন, এমন কি বড়লাট-ছোটলাট পর্যন্ত। তিনি ছিলেন অমিতব্যয়িনী। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব সমস্ত মতই পালন করতেন এবং সমস্ত দেবদেবীর অর্চনা করতেন। কিছুই অবহেলা করতেন না। বলতেন, সমস্তই যখন হিন্দুধর্মের অন্তর্গত তখন কাউকেও অবহেলা করা উচিত নয়।

দুর্গোৎসবের সময় মহাধুমধাম করে কলাবৌকে স্নান করানো হতো। একবার ঐ সময় রাসমণির লোকজন খুব ঘটা করে জানবাজার স্ট্রীট দিয়ে কলাবৌকে নিয়ে যাচ্ছে। জনৈক ইংরেজ ঢাকির বাজনা শুনে প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আমার বাসার সামনে এরকম হৈ-হল্লা করা চলবে না।

রাণী রাসমণির লোকজন সাহেবের নিষেধাজ্ঞা শুনলো না। তারা বললে, এ রাণীমায়ের আদেশ। আমরা কিভাবে বাজনা বন্ধ রাখবো ?

সাহেব বারংবার প্রতিবাদ করেও কিছু ফল পেলেন না। তখন তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

কিন্তু পুলিশ এলো না।

তার পরদিন পঞ্চাশটি ঢাকি এসে উৎসবটিকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তুললো। এমন ঢাকবাদ্যির আয়োজন দেখে পুলিশের লোকেরা নোটিশ দিলে, বিনাপাশে কোন শোভাযাত্রা বেরুতে পারবে না।

রাসমণি পুলিশের ঐ বিজ্ঞপ্তিতে কর্ণপাত করলেন না। গভর্ণ-মেণ্টের কাছে পুনঃপুনঃ আবেদন জানালেন। সেখান থেকে কোন উত্তর এলো না।

শেষকালে তিনি নিজের লোকজনকে আদেশ দিলেন, জান-বাজার স্ট্রীট ও বাবু রোডে কয়েকখানা গরান দিয়ে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে দাও।

অনুগতেরা তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কাজে নামলো। জানবাজার স্ট্রীট ও বাবু রোডে কয়েকখানা গরান দিয়ে চলাচলের রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দিল।

এতে করে রাসমণির নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর তেজস্বিতার কাহিনী জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো।

ওদিকে পথ বন্ধ হওয়ার জন্যে পুলিশ এলো। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে রাসমণি পথ মুক্ত করলেন। নিজের প্রতিজ্ঞাও অটল রইলো আমৃত্যুকাল পর্যন্ত। পুলিশ তার আদেশ প্রত্যাহার করলো। এতে করে তাঁর নাম দেশময় রটে গেল। সকলে তাঁকে 'রাণী' বলে ডাকতে লাগলো।

রিভার পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা জলকরের প্রবর্তন করলেন। কর না দিয়ে কেউ গঙ্গা থেকে মাছ ধরতে পারবে না। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ধীবরেরা এসে বড়লোকের কাছে তার প্রতিকার প্রার্থনা করলো। কেউ সাড়া দিলো না। একমাত্র রাসমণি দিলেন। হতাশাগ্রস্ত ধীবরদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমরা সকলে আজ বাড়ি ফিরে যাও। আমি যেভাবে হোক এ বিষয়ের সুচারু উপায় ঠিক করে আগামীকালই তোমাদিগকে জানাব। তোমাদের কাউকেও আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। যা-কিছু লাগবে আমিই সব তোমাদের সাহায্য করবো।

রাসমণির কথা শুনে শান্ত হলো গরীব ধীবরেরা। মুখে মুখে

উচ্চারিত হলো সাধুবাদ। হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে সকলে চলে গেল নিজেদের বাড়িতে।

অতঃপর রাণী জামাতাদের আহ্বান করে বললেন, তাদের যে প্রকারে হোক আমি সাহায্য করবো। মাসিক কত ট্যাকস্ লাগবে ও কি নিয়মাবলী হয়েছে, অফিসে গিয়ে সমস্ত জেনে এসো।

রাণীর কথামত তক্ষুণি একজন কর্মচারীকে পাঠানো হলো। সে খবর এনে রাসমণিকে জানালো।

রাসমণি বললেন, কাল অফিসে গিয়ে কাশীপুর থেকে মেটেব্রুজ পর্যন্ত সমস্ত নদী, যত টাকা লাগবে জমা করে আসবে, কোনও মতে যেন অন্যথা না হয়।

পরদিন কয়েকটি আমলা অফিসে গিয়ে এই সমস্ত জায়গা বার্ষিক দশ হাজার টাকায় জমা করে এলো।

রাসমণি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেখানকার পাট্টা লিখে রেজিস্ট্রী করে নিলেন। কয়েকদিন গেলে রাসমণি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতামত একদিন আদেশ দিলেন, নদীতে আজ কোন জাহাজ, স্টীমার কিংবা অন্য কিছুই যেতে দিও না। বোয়ায় বোয়ায় লোহার শিকল বেঁধে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করো।

রাণীর কথামত ধীবরেরা তৎপর হলো। ওদিকে পুলিশের দারোগা এলেন। রক্তচক্ষু বের করে বললেন, এসব করতে কে আদেশ দিয়েছে ?

ত্রস্ত ধীবরেরা নির্বিকার। ভয়ে তাদের সর্বশরীর কম্পমান। তাদের নিরুত্তর থাকতে দেখে দারোগার মাথায় খুন চাপলো। তিনি অত্যন্ত গর্জে উঠলেন। বললেন, শীগ্‌গির স্বীকার করো। নচেৎ তোমাদের ভয়াবহ শাস্তি পেতে হবে।

ধীবরেরা এবার মুখ খুললো। বললে, রাণীমার আদেশ।

দারোগা মুখ বিকৃতি করে বললে, কে তোমাদের রাণীমা? দাঁড়াও আমি তোমাদের সব চালাকী ভাঙ্‌চি।

এই বলে রাগে গরগর করতে করতে দারোগা গঙ্গার তীর থেকে চলে গেলেন।

আতঙ্কগ্রস্ত ধীবরেরা আবার এলো রাসমণির কাছে। তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে অন্তরের দুঃখ নিবেদন করলো। বললে, আপনি আমাদের মা-বাপ। আমাদের বাঁচান। আপনি না বাঁচালে পুলিশের দারোগার হাতে আমাদের প্রাণ আর আস্ত থাকবে না।

রাণী শুনলেন সমস্ত কথা তাদের মুখে। পরে পুলিশের দারোগাকে ডেকে বললেন, জাহাজ-স্টীমার প্রভৃতি নদীর ভেতর দিয়ে গেলে সমস্ত মাছ পালিয়ে যায়। মাছ ধরবার বড় অসুবিধে হয়। অতএব অতো খাজনা আমি কোথায় পাবো? আর কি ভাবেই বা দেবো।

দারোগা শুনলেন না রাসমণির কথা। জোর গলায় বললেন, অতো খাজনা আপনাকে দিতেই হবে।

অগত্যা রাসমণি আদালতের শরণাপন্ন হলেন। মকদ্দমা করলেন।

অন্যদিকে বুদ্ধিমতী রাসমণি গভর্ণমেণ্টে পুনঃপুনঃ এই ট্যাক্সের জন্যে আবেদন করতে লাগলেন। গভর্ণমেণ্ট আর নিস্তব্ধ থাকতে না পেরে গঙ্গার জলকর রহিত করলেন। এই মকদ্দমায় রাসমণি বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। সেই কারণে ধীবরেরা গান রচনা করে রাসমণির নাম পথেঘাটে প্রচার করতে লাগলো,—

‘ধন্য রাণী রাসমণি
কৈবর্ত্ত রমণী—’

কলেজী বিদ্যা না থাকলেও সাধারণের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন রাণী রাসমণি। বিশেষ করে বিষয়-আশয় ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তাঁর জামাতাগণ বিষয়ের কাজে দেখা-শুনো করলেও তিনি মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিতেন। তাদের ভুলভ্রান্তি হলে ধরে দিতেন এবং তা শোধরাবার জন্যে উপদেশ দিতেন। নিজের চেষ্টায় বিষয়-সম্পত্তি বাড়ালেন। বেলেঘাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি জায়গায় বাজার কিনলেন এবং নিজের নামে দলিল করলেন পাছে জামাইদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে।

রাসমণি প্রায়ই আসতেন কালীঘাটে স্নান করতে। ওখানে থাকার জন্যে একটি বসতবাড়ি নির্মাণ করালেন। যাত্রীদের বড় অসুবিধা ভোগ করতে হতো স্নানের ঘাট না থাকার জন্যে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে স্নানের ঘাট তৈরী করে দিলেন। কালীঘাটে এসে মাঝে মাঝে দু'-একদিন ওখানে থাকতেন। মুমূর্ষুদের গঙ্গা-যাত্রার জন্যে ঐ বাড়িতে থাকতে দিতেন।

স্বামী বেঁচে থাকতে তিনি কখনো পিত্রালয়ে যাননি। এখন ঠিক করলেন, জামাতাদের সঙ্গে পিত্রালয়ে যাবেন। তার আগে হালিসহরে বাড়ি তৈরীর আয়োজন করিলেন। সেখানে ঘটা করে বাড়ি তৈরী হলো। কেননা পৈতৃক ভিটের যা-কিছু অবশিষ্টাংশ ছিল তা এতদিনে দেখাশোনার অভাবে ভগ্নপ্রায় হয়ে গেছে। তাই নতুন করে কোন ঘরবাড়ি তৈরী না করলে সেখানে বাস করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে।

নতুন বাড়ি তৈরী হলো। রাণী জামাতাদের সঙ্গে সেখানে গেলেন। প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পিত্রালয়ে কাটালেন। তারপর উনি সেখান থেকে এলেন ত্রিবেণীতে। সেখানে স্নান করলেন। দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র, রৌপ্যমুদ্রা ও অন্ন বিতরণ করলেন।

পরের দিন মহোৎসবের আয়োজন করলেন। গ্রামের বহু দরিদ্র-নারায়ণদের খাওয়ালেন। এর পর তিনি হালিসহরের গঙ্গায় একটি ঘাট তৈরী করে দেবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পরে জামাতাদের নির্দেশ দেন, অবিলম্বে এখানে একটি স্নানের ঘাট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করো।

জামাতাগণ তাঁর আদেশমত কাজ শুরু করে দিলেন।

পরের দিন কলকাতায় ফিরলেন। সেই থেকে প্রতিবছর তিনি ত্রিবেণীতে গিয়ে স্নান করতেন। দ্বিতীয়বার গিয়ে হালিসহর ঘাট উৎসর্গ করেন জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

এবার রাণী রাসমণির ইচ্ছে হলো নবদ্বীপধামে যাবেন। যুগাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যেখানে আবির্ভূত হয়েছেন সেস্থান দর্শন না করে কি পারেন! জামাতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন নবদ্বীপধামে। এখানে মহাপ্রভুর প্রতিমূর্তি দেখে আনন্দ পেলেন এবং প্রচুর অর্থ খরচ করে তাঁর ভোগের আয়োজন করলেন। পরে দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করলেন।

তাঁর ইচ্ছা হলো এখানকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ডেকে এনে কিছু প্রণামী দেবেন। জামাতারা গেলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বাড়িতে। তাঁরা নিমন্ত্রণের কথা শুনে রাণীর পরিচয় নিলেন। পরে একটু ভেবেচিন্তে বললেন, আমরা শূদ্রের বিশেষ করে কৈবর্ত রমণীর দান নিতে পারবো না।

রাসমণির কানে এলো তাঁদের মন্তব্য। তিনি তাঁদের কিছু না বলে পাঁচশো গরদের ধুতি এবং তত্থুত্তরীয় আনালেন। পরে এক এক জোড়া গরদের ধুতি ও এক একটি মোহর চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণকে উপহার দিলেন। তাই দেখে দলে দলে ব্রাহ্মণরা এলেন। রাসমণিও সকলকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, রাজার দান নিলে কোন দোষ হয় না।

নবদ্বীপধামে তিনদিন থাকার পর বাড়ি ফিরলেন রাসমণি।

নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করার পর তিনি স্থির করলেন যাবেন পুরীধামে। বিশখানি পালকিতে করে লোকজন নিয়ে চললেন। আগে ঠিক হয়েছিল, রাণী নিজেই পালকিতে চেপে যাবেন। তাঁর অনুচরবর্গ যাবে হেঁটে। কিন্তু রাণী সেই প্রস্তাব শুনে বিচলিত হলেন। বললেন, আমি আরামে যাবো আর ওরা কষ্ট করবে তা হবে না। বিশেষ করে ও পথ বড় দুর্গম। যখন যাবে তখন সকলে পালকিতে চেপে চলুক। সেই কারণে একটি পালকির বদলে বিশখানি পালকির ব্যবস্থা করা হলো।

পাঁচ ক্রোশ অন্তর ঘাঁটি স্থাপন করলেন যাতে পালকিবাহকদের কোন কষ্ট না হয়। রাস্তাঘাট বড় দুর্গম। বাহকদের বেশ কষ্ট হলো।

পরে ওঁরা সুবর্ণরেখার অপর তীরে এসে পৌঁছুলেন। ওখানে এসে আদেশ দিলেন রাণী, এখান থেকে আরম্ভ করে যতদূর ভাল রাস্তা না থাকে সমস্ত জায়গায় একটি বিস্তীর্ণ রাস্তা করে দাও, যাওয়ার সময় যেন এই পথ দিয়ে যেতে পারি।

এই আদেশ দিয়ে রাণী রাসমণি পুরী অভিমুখে যাত্রা করে একপক্ষ কাল পরে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হন।

পবিত্র পুরীধামে অবস্থান করার সময় তিনি দীনদুঃখীদের ভেতর বিস্তর অর্থ ও বস্ত্র দান করলেন। যাবার সময় বাড়ি থেকে তিনটি বড় এবং কয়েকটি ছোট সোনার মুকুট নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসমণি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই সমস্ত জগন্নাথদেব, বলরাম প্রভৃতি বিগ্রহকে পরিয়ে দেন। সেইদিন সেখানে যাবতীয় লোককে অন্ন বিতরণ করলেন।

পুরীতে জাতিভেদ-প্রথার প্রচলন না দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। নিজের মনের ভাব সানন্দে প্রকাশ করে বললেন, আমার একান্ত বাসনা, এখানে অবস্থান করে যাবজ্জীবন কাটাই।

পুরীতে থাকার সময় অনেক ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে আহার করে অত্যন্ত খুশী হন রাসমণি। মন্তব্য করলেন, আমি যত জায়গা দেখেছি, পুরীর মত জায়গা কোথাও দেখি নি।

পুরীধামে তিন দিন কাটিয়ে তিনি নতুন রাস্তা দিয়ে কমপক্ষে দু'মাসের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন। আসার সময় জগন্নাথদেবের সেবার জন্যে হাজার মুদ্রা দান করে এলেন।

রাসমণি কোন তীর্থ হতে ফিরলে বিস্তর ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও দীন-দুঃখীদের ডেকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়ে যথোচিত অর্থ ও বস্ত্র দান করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। বিশেষ করে শ্রীক্ষেত্র হতে ফিরেছেন। তাই এবারের কাঙাল-ভোজনের আয়োজনটি বড় জোরদার হলো।

'সব তীর্থ বার বার।
গঙ্গাসাগর একবার॥'

রাণী রাসমণির মনে পড়ে গেল এই কথাটি। তিনি এবার ঠিক করলেন গঙ্গাসাগরে যাবেন। লোকজনকে আদেশ দিলেন, নির্দিষ্ট দিনে পালকি ও নৌকো ঠিক করো। আমি গঙ্গাসাগরে যাবো।

তাঁর আদেশমত পালকি ও নৌকোর আয়োজন করা হলো।

পালকি নেওয়া হলো এই কারণে, যদি কোন দুর্যোগ নামে তাহলে তীরে নৌকো লাগিয়ে পালকিতে চেপে কারও আস্তানায় এসে আশ্রয় নেওয়া চলবে।

শুভদিনে দলবল নিয়ে যাত্রা করলেন রাণী রাসমণি। ডায়মণ্ড-হারবারের কাছে গঙ্গার বিরাট রূপ দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। পরে ওখান থেকে আরও অগ্রসর হলেন দক্ষিণদিকে। দেখলেন সাগরের রূপ। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ এবং দমকা হাওয়া এসে লাগলো তাঁর নৌকোর গায়ে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিলো যে নৌকো উল্টে যাবার উপক্রম হলো। ওদিকে রাণীর সহচর-সহচরীবৃন্দের দেখা নেই। তাদের নৌকো বহুদূরে পিছিয়ে পড়েছে।

রাণী দেখলেন, অদূরে চড়া দেখা যাচ্ছে। ছু'-একটি মাটির বাড়িও।

তাই দেখে লোকজনদের বললেন, তীরে নৌকো লাগাও। নচেৎ জলে ডুববার ভয় আছে। আর ওরাও এখনো এসে পৌঁছলো না। ওদের জন্যে অপেক্ষা করি।

লোকজন তীরে নৌকো ভেড়ালো। রাণী তীরে এসে নৌকোয় চড়লেন। নৌকো করে এলেন একজন ব্রাহ্মণের কুটিরে। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। দিন আনে দিন খায়।

রাণীকে দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তার পুত্রবধূ অবাক্ হয়ে গেল। মনে করলো তিনি বোধ হয় কলকাতার কোন ধনী পরিবারের বধূ হবেন। তাই কিভাবে আপ্যায়ন করবেন ঠিক করতে পারলেন না।

রাণী ওদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই ওদের কাছে আত্মপরিচয় গোপন করে বললেন, আমি কলকাতায় থাকি। আমার সামান্য অর্থ আছে। কিন্তু অর্থ সুখ দেয় না, দুঃখ দেয়।

এক রাত্রি কাটালেন রাণী ওদের ছোট্ট কুটিরে। পরদিন ব্রাহ্মণী ও তার পুত্রবধূকে একশো মুদ্রা দিয়ে প্রণাম করে ফিরে এলেন।

কুটিরের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাতে দেখলেন, পেছনে পড়া যাত্রীরা আসছে। ওদের সঙ্গে দেখা হতে আনন্দ পেলেন।

পুনরায় সকলে একসঙ্গে যাত্রা করলেন। নৌকা যথাস্থানে এলো। রাসমণি নীচে নামলেন। পুণ্যলগ্নে সাগরজলে অবগাহন করলেন অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে।

স্নানের পর দীনদরিদ্রদের মধ্যে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর জীবদ্দশায় দু'-তিনবার গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন রাণী রাসমণি।

এবার রাণীর ইচ্ছে হলো বারাণসীধামে যাবার। পঞ্চাশখানা নৌকো ঠিক করা হলো। ছ'মাসের আহার্য দ্রব্য নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা শুরু করলেন।

তখন এদেশে বর্ধমান পর্যন্ত রেলপথ হয়েছে। তাই জলপথে যাবার আয়োজন করলেন। দেশে তখন দারুণ সঙ্কট কাল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মুখ ব্যাদান করে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে। বহু লোক অনাহারে মরতে লাগলো।

রাসমণি সেই দুর্যোগের মধ্যে পুণ্যতীর্থে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। ভাবলেন, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে, কাল নেই। এ জীবনে যদি পুণ্যকর্ম না করা যায় তাহলে আর কবে করবো ?

বারাণসীধামে রওনা হবার আগের দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, রাসমণি, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাঁর স্ত্রী দুর্গার সমভিব্যাহারে মানবমূর্তি ধারণ করে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে অনাথা দরিদ্রদের অন্নদান করতে বলছেন। সেই রমণীমূর্তি যেন তাঁকে বললো, এই সময়ে বারাণসী যাওয়া পরিত্যাগ করো। গঙ্গাতীরে আমাদের অন্যতর কালী প্রতিমূর্তি স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করো।

পরদিন কাশী যাওয়ার আয়োজন পরিত্যাগ করলেন। নৌকোর

খাদ্যদ্রব্যগুলির কিছু অংশ মা গঙ্গাকে উৎসর্গ করলেন, কিছু বা আতুর ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

কয়েকদিন পরে জামাতাদের সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের জায়গা নির্বাচন করতে বেরুলেন।

কলকাতার কাছে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর নামে একটি জায়গায় গভর্ণমেণ্ট মেগাজিনের সংলগ্ন একটি জায়গা কিনলেন। নিজে দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। কিন্তু শান্তি এবং নির্বিঘ্নে কার্যসমাধা হলো না। নানারকম বিঘ্ন দেখা দিলো। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়, সাতক্ষীরার পূজ্যতম প্রাণনাথ চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারেরা ঐ বিষয়ে বাধা দিতে লাগলেন। রাসমণি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁদের সঙ্গে মকদ্দমা করতে লাগলেন।

এই সময়ে যখন তাঁদের পরস্পর অত্যন্ত বিবাদ চলছিল তখন একদিন রামরতনবাবু রাসমণিকে বলে পাঠালেন, তিনি স্ত্রীলোক হয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন করছেন? স্ত্রীলোকের এরূপ প্রতিজ্ঞা ভাল নয়।

রাসমণি এই কথা শুনে ঈষৎ হেসে বললেন, রতনবাবুর এটি ভারি ভ্রম। তিনি জানেন না, এ সংসারে স্ত্রীলোকেরই ক্ষমতা বেশি। তিনি জানেন না, শক্তি নিজেই স্ত্রী। মহাবীর শুম্ভ-নিশুম্ভ স্ত্রীলোকের হাতে নিধনপ্রাপ্ত হন। আমি স্ত্রীলোক হলে ক্ষতি কি? তাঁদের ক্ষমতা থাকে আমার কাছ থেকে নিন।

হতাশ হলেন না রাসমণি। মকদ্দমায় জয়ী হলেন। দেবালয়টি তৈরী করতে তাঁর বিস্তর ব্যয় হলো। ন'লক্ষ টাকা। গঙ্গার তীরে দ্বাদশ শিবমন্দির, কালীমন্দির, নাটমন্দির, রাধাগোবিন্দের মন্দির, পুরোহিত-কক্ষ প্রভৃতি তৈরী করা হলো।

ভগবতীদেবী আর গোপালের মূর্তি আনা হলো প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু মূর্তি প্রতিষ্ঠারও তো একটা শুভ দিনক্ষণ আছে। যখন তখন ও কাজ করা যায় না।

রাণী ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় তাঁর ভাবনায় বাদ সাধলো ভগবতীর আদেশ। তিনি স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন, বাক্সের ভেতর থেকে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। শীগ্‌গির প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করো।

দেবীর আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপত্রের জন্যে চারদিকে লোক পাঠালেন রাণী রাসমণি। সকল পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠানো হলো।

পণ্ডিতেরা কিন্তু বেঁকে বসলো। বললে, বিগ্রহকে অন্নভোগ দেওয়া চলবে না। কারণ ও হলো শূদ্রাণীর ঠাকুর। অন্নভোগ দিলে কেউ তাকে দেবতার প্রসাদ বলে মুখে দেবে না।

পণ্ডিতেরা শাস্ত্রকথা উল্লেখ করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

ভক্তিমতী রাণী কিন্তু তাদের কথায় কান দেন নি। তাঁর মনের একান্ত বিশ্বাস তিনি একজন ভক্তিমতী রমণী। দেবতা তাঁর ওপর তুষ্ট। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে দেবতা অন্নভোগ গ্রহণ করবেন না একথা সম্পূর্ণ ভুল।

তাই চারদিকে লোক পাঠালেন রাণী রাসমণি। নতুন ব্যবস্থা চাই।

অনেক পণ্ডিত এলো। তিনি তাদের কথা শুনলেন। তারপর নিয়মমত বিদায় দিলেন।

শেষকালে ঝামাপুকুর টোলের পণ্ডিত রামকুমারের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র পাওয়া গেল। তিনি বললেন, রাণী যদি তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে অন্নভোগ দেবার কোন বাধাই থাকবে না। ব্রাহ্মণরাও বিগ্রহের প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবে। তাতে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না।

ব্যবস্থা পাওয়া গেল কিন্তু এই ব্যবস্থামত পূজো করতে কোন ব্রাহ্মণকে পাওয়া গেল না। কেউ বিগ্রহকে পূজো করতে রাজী হলো না।

রাজকুমার পূজোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁকেই ডেকে পাঠানো হলো মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে।

বাংলা ১২৫৯ সালে পুণ্য স্নানযাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হলো। এই উৎসবে মহাধুমধাম পড়ে গেল।

বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভারতের বহু স্থান থেকে এসে দান গ্রহণ করলেন। কেবল দান গ্রহণ করেন নি গদাধর। রামকুমারের

সে উৎসব দেখার পর মন্দিরের বাইরে এলো। দোকান থেকে মুড়কি আর মিষ্টি কিনে তাই খেলো। তারপর বাড়িতে ফিরে এলো।

সকলেই যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরলেন না কেবল রামকুমার। গদাধর ভেবে অস্থির। দু'দিন চলে গেল এখনো পর্যন্ত বড় ভাইয়ের দেখা নেই।

তিনি ভগবতীদেবীর নিত্যপূজায় ব্রতী হলেন। রাণীরই অনুরোধে একাজ নিলেন।

দু'দিন পরে বাড়ি ফিরলেন রামকুমার।

গদাধর অগ্রজকে শুধোলো, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? রামকুমার বললেন, আমি যে মা ভবতারিণীর নিত্য-পূজারী হয়েছি। তাই ঠিক সময়ে এখানে আসতে পারি নি।

গর্জে উঠলো গদাধর। বললে, ওকাজ কেন করলে? দেখ ভাই, আমাদের নিত্য অভাবের সংসার, বললেন রামকুমার। কোন স্থায়ী আয় নেই। এখানে একটি স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া রাণীর জামাই মথুরামোহন আমাকে বড ভালবাসেন।

রামকুমার বুঝতে পারলেন গদাধরের রাগ হয়েছে। তাই

ভাইকে বুঝিয়ে বললেন, দেখো, লৌকিক মতে নিন্দের কথা মানলেও এটা ধর্মবিরুদ্ধ নয়। আমি শাস্ত্রের প্রমাণ দেবো। রাণী রাসমণি নিজে যে জাতিরই হোন, এ দেবালয় তাঁর গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মতঃ তাঁর গুরুদেবেরই এতে অধিকার। সেইজন্যে আমি এই মন্দিরে পূজো করলেও ধর্মবহির্ভূত কাজ করি নি।

রামকুমারের যুক্তি মনঃপূত হলো না গদাধরের। তবু সে রামকুমারের কাছে রইলো। সিধে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে রেঁধে খেতো।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কনৌজ, বারাণসী, উড়িষ্যা ও বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের আহ্বান জানানো হলো। তাঁরা সদলবলে এলেন। তাঁদের যাতায়াতের ভাড়া, চেলী ও গরদের পরিধেয় বস্ত্র ও কমপক্ষে প্রতিজনকে একটি করে মোহর দেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠার পর ওকে চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করলেন। ঐ সময়ে রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সালবাড়িয়া নামে একটি পরগণা লাটে ওঠে। রাসমণি সুবিধে বুঝে ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকায় তা কিনে নেন। বিলম্ব না করে তখুনি তা দেবালয়ের নামে উৎসর্গ করে দেন আর এই মর্মে একখানা উইল করেন, আমার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যে কেউ এর সেবায় শৈথিল্য প্রকাশ করবেন তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারী কেউই এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর সেইদিন হতে এর সেবা হতে বঞ্চিত হবেন।

উইলনামা রীতিমত রেজিস্টারী করে সমস্ত বিষয়টি দৃঢ়ীভূত করলেন। এর ফলে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

কিগো মামা, তুমি এখানে আছ। বেশ! বেশ!! সেইজন্যেই

তো এখানে এলুম। বলেকয়ে যদি বাবুদের বাড়িতে আমার একটা রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দাও, বললে হৃদয় গদাধরকে।

সে গদাধরের বোনপো। তার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট। প্রায় সমবয়সী। তাই গদাধরের সঙ্গে হৃদয়ের খুব ভাব। দু'জনে মহা আনন্দে থাকে দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে এসে গদাধর কিন্তু বাল্যলীলা ভোলে নি। মাটি নিয়ে দেবদেবীর মূর্তি গড়ে।

একদিন শিবের মূর্তি গড়ছে গদাধর। মথুরবাবু তাই দেখছেন একদৃষ্টিতে।

মূর্তিগড়া শেষ হলে তাকে পূজো করলো গদাধর।

গঙ্গায় বিসর্জন দিতে যাবে এমন সময় মথুরবাবু মূর্তিগুলি নিয়ে নিলেন। তাঁর নজরে বড় ভাল লেগেছে মূর্তিগুলি।

মূর্তিগুলি নিয়ে সটান চলে এলেন মথুরবাবু রাণী রাসমণির কাছে। পরে জানতে পারলেন, গদাধর রামকুমারের ছোট ভাই।

মথুরবাবু রাণী রাসমণির প্রিয় জামাই। গদাধরের শিল্পগুণের জন্যে তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সুতরাং তাকে দক্ষিণেশ্বরে রাখার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এবিষয়ে পরে রাণীর সঙ্গে আলাপ করলেন।

রাণী বললেন, আমরা রামকুমারকে ও কথা জানাব। তিনি যদি তাঁর শিল্পী ভাইকে দক্ষিণেশ্বরে রাখেন তো ভাল হয়।

মথুরবাবু অমনি চলে এলেন রামকুমারের কাছে। বললেন, আপনার ভাইকে এখানে রাখুন। ওর কোন কষ্ট হবে না।

রামকুমার বললেন, আমার ছোট ভাইয়ের এতে মত হবে বলে মনে হয় না। কারণ সে অতি নিষ্ঠাবান।

গদাধর রাজী হলো না দক্ষিণেশ্বরে থাকতে। মথুরবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে চললো। মথুরবাবু তাকে খুঁজে খুঁজে ফিরলেন। গদাধরও তত লুকিয়ে রাখলো নিজেকে।

একদিন দূর থেকে গদাধরকে দেখতে পান মথুরবাবু। ইশারায় কাছে আসবার জন্যে বললেন।

গদাধর রাজী হলো না।

তার সঙ্গে ছিল হৃদয়। সে বললে, যাও না মামা। একজন বড়লোক তোমাকে ডাকছেন। তুমি যাও না কেন?

গেলেই এখানে থাকতে বলবে, বললে গদাধর।

হৃদয় বললে, বললেই বা, এখানে থাকো না কেন। এখানে থাকলে তো ভালই হবে।

আমি একা থাকতে পারবো না, বললে গদাধর। তুই যদি
থা... ...কতে পারি।
রামকুমারও গ... ...য বললে, হ্যাঁ, আমি থাকবো।
তোমায় ডাকছেন। তুমি ... বললেন, একজন গণ্যমান্য লোক
কেবল বলা নয়, রামকুমার ...ছা না কেন?
মথুরবাবুর কাছে। ...ধরের হাত ধরে নিয়ে এলেন
মথুরবাবু জপে বসলেন। গদাধর
মত দাঁড়িয়ে রইলো। ...গ্রজের হাত ধরে ছবির
জপ শেষ হলে মথুরবাবু গদাধরের মুখে
পরে তাকে মন্দিরের পশ্চিমদিকে নিয়ে এসে ...র দিকে তাকালেন।
এখানেই থাকো। ...বললেন, বাবা, তুমি
গদাধর বললে, এসব কাজে বড় হাঙ্গা... ...মে
জিনিসপত্র হেপাজত করা বড় শক্ত। ...মা। ঠাকুরের সব
মথুরবাবু শুনলেন না গদাধরের আপত্তি।

আবার বললেন, তুমি এখানে থাকো বাবা। তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

গদাধর হৃদয়কে দেখিয়ে বললে, ও যদি থাকে তাহলে আমি থাকতে পারি।

হঠাৎ রামকুমার এলেন। শুধোলেন, আপনাদের কথাবার্তা হলো ?

মথুরবাবু বললেন, এই হচ্ছে।

পরে গদাধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা বেশ বাবা, আপনি শ্যামা মায়ের বেশকারী হবেন। তুমি বাবা এখানেই থাকো।

রামকুমারকে আবার বললেন মথুরবাবু, আর হৃদয়ঠাকুর আপনাদের ত্থ'ভাইয়ের আর ত্থ'মন্দিরের জিনিসপত্র দেখাশোনা করবেন।

দেওয়ানকে ডেকে এই নতুন ব্যবস্থার কথা জানালেন মথুরবাবু। এখন থেকে গদাধর হলো কালীমন্দিরে শ্যামা মায়ের সাজকর আর হৃদয় তার অলঙ্কাররক্ষক।

ভাগীরথী নদীর কোলঘেঁষে কতকগুলি সিঁড়ি উঠে গেছে। এগুলি তৈরী করে মেকিন্টশ কোম্পানী। এটি পোস্তাকে উত্তরে ও দক্ষিণে ত্থ'ভাগে ভাগ করেছে। চাতালের পূবদিকে বিস্তৃত চাঁদনি। চাঁদনির ত্থ'দিকে ছ'টি ছ'টি করে বারোটি শিবমন্দির। দক্ষিণভাগের ছ'টি মন্দিরে দক্ষিণ হতে উত্তরদিকে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর বা নন্দীকেশ্বর ও নরেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজিত। উত্তরভাগের ছ'টি মন্দিরে দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর ও নির্জরেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। এই দ্বাদশ মন্দির শ্বেত ও কৃষ্ণ

প্রস্তরমণ্ডিত মন্দিরতলে মণ্ডলাকার বেদীর ওপরে কৃষ্ণপাথরের তৈরী শিবলিঙ্গ আর শিবের পূবদিকে কৃষ্ণপাথরের তৈরী বৃষভ রয়েছে। সোপকরণ সামান্য নৈবেদ্যোপচারে দ্বাদশ শিবের নিত্য পূজা ও সান্ধ্য আরতি হয়। দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন আর শিবরাত্রিতে দ্বাদশ শিবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূবদিকে টালি দিয়ে ছাওয়া বিশাল আঙ্গিনা উত্তর-দক্ষিণে গঙ্গাতীরের সমান্তরালে বিস্তৃত। ওটি লম্বায় ৪৪০ ফুট এবং চওড়ায় ২২০ ফুট। ওর উত্তর, দক্ষিণ ও পূবদিকে তিন পংক্তি একতালা দালান এবং পশ্চিম প্রান্তে দ্বাদশ শিব-মন্দিরের শ্রেণী। প্রত্যেক প্রান্তের মাঝখানে বড় বড় বহির্দ্বার। ওর পশ্চিমদিক উন্মুক্ত আর পূবদিকব্যাপী মন্দির দু'টি সংযুক্তভাবে অবস্থিত। আঙ্গিনার পূবদিকে নবচূড়ামণ্ডিত কালীমন্দির। তার উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। কালীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তির নাম ভবতারিণী। মন্দিরের চূড়ায় প্রথমে চারটি চূড়া বিদ্যমান। তার মধ্যে পূব-দক্ষিণ কোণের চূড়াটি প্রচণ্ড ঝড়ে বেঁকে যায় কিন্তু স্থানচ্যুত হয় নি। দ্বিতীয় স্তরে আরও চারটি চূড়া। সকলের ওপরে নবম চূড়া। একসময় কালীমন্দিরে বজ্রপাত হয়েছিল। ফলে দেবীমূর্তির চারপাশে মর্মর প্রস্তরগুলি বিক্ষত ও বিদীর্ণ হয়। কিন্তু দেবীমূর্তি ছিল অক্ষত। ঐ দুর্ঘটনার পর মন্দিরের উত্তর-পূব কোণে বজ্র-নিবারক লৌহ-শলাকা স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্মরমণ্ডিত। তার ওপর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত দ্বিস্তবক বেদী। বেদীর ওপরে রৌপ্যময় শতদল পদ্ম ও তার ওপর শ্বেতমর্মরময় মহাকাল শায়িত। ঐ শতদলের পরিধি প্রায় তিন হাত। মহাকালের হৃদয়ের ওপর ন্যস্তপদা দক্ষিণাস্যা, কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিতা, নানাভরণভূষিতা, বারাণসী-চেলী পরিহিতা চতুর্ভুজা ভবতারিণী কালীমূর্তি।

ভবতারিণী দেবীর পায়ে আলতা পরানো। তার ওপর নূপুর গুজরীপঞ্চম, চুট্কী ও পাঁজেব। কটিতটে নিমফল, পাটা ও সোনার নরকরমালা। প্রকোষ্ঠে বালা ও নারকেল ফুল, পৈঁচেও বাকটি, বাহুতে তাড়, তাবিজ ও বাজু। বাঁ-হাত দুটিতে খড়্গ ও দৈত্যমুণ্ড আর দক্ষিণ হাত দুটিতে বরাভয় মুদ্রা। গলায় চিক, মুক্তার সাতনরী, সোনার বত্রিশ নরমুণ্ডমালা, তারাহার ও সোনার মুণ্ডমালা। নাকে নথ, কানে কানবালা ও কানপাশা, ফুল ঝুম্‌কো ও চৌদানী, মাথায় মণিখচিত সোনার মুকুট। প্রতিমার পেছনে রূপোর কারুকার্যযুক্ত ছ'টা ও ওপরে রজতমণ্ডিত স্তম্ভবদ্ধ রূপোর ফ্রেমে বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। পদ্মাসনের ওপর পশ্চিম দিকে অষ্টধাতুর তৈরী সিংহ, পূবদিকে গদিকা ও ত্রিশূল। বেদীর পূব-দক্ষিণ কোণে শিবা, দক্ষিণে রূপোর সিংহাসনে শ্রীধর ও দধিবামন শালগ্রামদ্বয়, কৃষ্ণপাথরের বৃষভ ও উত্তরপূর্ব কোণে শ্বেতপাথরের হংস। বেদীর নিম্নস্তবকে পেতলের তৈরী সিংহাসনে সন্ন্যাসীর দেওয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রিয় রামকাকা নামে শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহ ও বাণেশ্বর শিব এবং অন্য সিংহাসনে চণ্ডীর পুঁথি। দেবীমূর্তির সামনে সিন্দূররঞ্জিত, পুষ্পমাল্য-শোভিত মঙ্গলঘট। মন্দিরের মধ্যে উত্তর-পূব কোণে রূপোর খাট ও তার ওপর বিচিত্র শয্যা ভবতারিণীর বিশ্রামের জন্যে রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে রূপোর বাটা, রূপোর কলসী, হাঁড়ী, স্থালী, গ্লাস, চামর প্রভৃতি যথানিয়মে সাজানো রয়েছে।

কালীমন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। প্রাঙ্গণ হতে পূবমুখে কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এবং শ্বেত-কৃষ্ণমর্মরমণ্ডিত প্রশস্ত দালান পেরিয়ে রাধাকান্ত ও নিস্তারিণী মন্দিরদ্বারে যাওয়া যায়। এর মধ্যে শ্বেতমর্মরমণ্ডিত মন্দিরতলে কালো পাথরের তৈরী দ্বিস্তবক বেদী। বেদীর রজতময় ত্রিস্তবক সিংহাসনে কালো পাথর দিয়ে তৈরী ত্রিভঙ্গ রাধাকান্ত বামে অষ্টধাতুনির্মিতা নিস্তারিণীকে নিয়ে পশ্চিমাস্যে বিরাজ

করছেন। রাধাকান্তের চরণযুগল সুবর্ণ নূপুর-শোভিত ও অলক্তক রাগরঞ্জিত। তাঁর ডান পা বাম পায়ের ওপর সংন্যস্ত ও পরনে রেশমী পীতবাস। প্রকোষ্ঠে সোনার বালা, হাতে মোহনবাঁশী, গলায় চাঁপাফুলের হার ও তুনর কণ্ঠহার, মুখে ভুবনমোহন হাসি, কানে মকর মুখ ও ঝুম্‌কো, ললাটে অলকা তিলক এবং মাথায় শিখিপুচ্ছ-শোভিত সোনার মুকুট। নীলবসনা নিস্তারিণীর প্রকোষ্ঠে সোনার বালা ও মুড়কি মাদুলি, বাহুতে বাজু, গলে পাঁচনর হার ও তুনর কণ্ঠহার, নাকে নথ আর মাথায় সোনার মুকুট। অষ্টধাতুর তৈরী গোপাল ও গরুড়মূর্তি যথাক্রমে রাধাকান্তের সামনে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাজিত। সিংহাসন ও বেদীর স্তবকসমূহে ছোট রূপোর সিংহাসনে শালগ্রাম, ব্রজলীলার ছবি, তুটি শ্বেতপাথরের বৃক্ষ, পেতলের সিংহাসনে গোপাল ও নামব্রহ্ম অঙ্কিত চিত্র। মন্দিরের মধ্যে পূব-দক্ষিণ কোণে খাটের ওপর বিছানা রাধাকান্তদেব ও নিস্তারিণী দেবীর বিশ্রামের জন্যে রাখা হয়েছে। সামনের দালানে ঝাড় আলো টাঙ্গানো আছে। ওটি এখন আর ব্যবহার করা হয় না। এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পূজারীর কাজে ব্রতী হন ১২৬৩ সালে, ইংরাজী ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে। তারপর ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজোর ভার নেন। মন্দিরের মধ্যে যে কারুকার্য দেখা যায় তা পুরী বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।

কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের ওপর মহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। চকমেলানো উঠোনের তিনদিকে একতলা ঘরের সারি। পূবদিকের ঘরগুলির মধ্যে ভাড়ার ঘর, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর ও ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিঘর। উঠোনের দক্ষিণের ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদের থাকার জায়গা। উঠোনের উত্তরে একতলা ঘরের ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। উঠোনের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে

গদাধরের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দা। বারান্দার পর পথ। তার পশ্চিমে ফুলের বাগান। তারপর গঙ্গাতীরের পোস্তা। ঘরের উত্তরেও পথ। পথের ওপর উদ্যান আর তার উত্তরে নহবৎ। নহবতের উত্তরে বকুলতলার ঘাট। এর উত্তরে আসমান ভূমি। তা জঙ্গলে ভরা। তারপর কবরডাঙা আর ঝাউয়ের বন।

এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে গদাধরের মধুময় জীবনের দিনগুলি কাটতো শ্যামা মায়ের নিত্যনতুন রূপসজ্জার কাজে।

মাকে রোজ মনের মত করে সাজাতো গদাধর। যেন মা তার কত আপন জন। গদাধরের মনে আনন্দের অন্ত থাকতো না। তার মনের পরিবর্তন দিন দিন বাড়তে লাগলো। ভাগ্নে হৃদয় কাছে থেকে মামাকে দেখতো।

গদাধরের মনে দুঃখ ছিল না বটে কিন্তু একটা কারণে তার মন অনবরত কণ্টকিত হতো। কৈবর্তের ঘরে খেতে তার মন সইলো না। তাই মা'র কাছে নিত্য অভিযোগ জানাত, মা তুই আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি!

বাংলা ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমী। তার পরের দিন নন্দোৎসব। এই দিনে এক অঘটন ঘটলো। রাধাকান্তের বিগ্রহ পূজো করে ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্যে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সেতল দেওয়া হলে পাশের ঘরে বিগ্রহকে নিয়ে যাওয়া হতো শোয়াবার জন্যে। আবার পরের দিন সকালে মন্দিরে আনা হতো পূজো করাবার জন্যে।

ক্ষেত্রনাথ বিগ্রহকে কোলে করে পাশের ঘরে যাবে, এমন সময় মার্বেল পাথরের পিছল পথে পা পিছলে পড়ে গেল। ফলে বিগ্রহের একটি পা গেল ভেঙে।

এই অমঙ্গলের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।* মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি দু'জনে বড় চিন্তিত হন। সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে খবর গেল, বিগ্রহের পা ভেঙে গেছে। এখন আপনারা কি রকম ব্যবস্থা দেবেন ?

পণ্ডিতরা এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সভা করলো। সকলে এক-বাক্যে বললে, ভাঙা বিগ্রহের পূজো হয় না। ওতে গেরস্থের অমঙ্গল হয়। নতুন বিধান দিলো তারা। ঐ বিধান অনুযায়ী পুরোনো বিগ্রহ জলে ফেলে দিয়ে নতুন বিগ্রহ গড়ার আদেশ হলো। মথুরবাবু সেই আদেশ শিরোধার্য করে কারিগরকে হুকুম দিলেন, আবার নতুন করে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ তৈরী করো।

রাণী রাসমণি শুনলেন সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি। নতুন বিগ্রহ তৈরী করার প্রস্তাব একরকম পাকাপাকি হয়ে গেল।

রাণী শেষকালে ভাবলেন, সকলের মত চাওয়া হয়েছে। অথচ একজন সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণের মতামত চাওয়া হয় নি। তিনি দক্ষিণে-শ্বরের গদাধর। মা ভবতারিণীর বেশকারী।

রাণীর কথা গদাধরের কানে গেল। গদাধর এলো, শুনলো সকল বৃত্তান্ত। তারপর ভাবাবিষ্ট হয়ে বললে, ভগবান আমাদের পরম আত্মীয়। তাঁকে আমরা পিতা, মাতা, সখা বা পুত্ররূপে আরাধনা করি। কিন্তু আমাদের পিতা, মাতা, সখা বা পুত্রের যদি অঙ্গহানি হয় তাহলে কি আমরা তাঁকে ত্যাগ করি, না চিকিৎসার ব্যবস্থা করি ? এখানেও তাই হোক। ভাঙা বিগ্রহের পা জুড়ে দেওয়া হোক।

গদাধরের কথামত রাণী মত পরিবর্তন করলেন। গদাধর পুরোনো বিগ্রহের পা জোড়ার ভার নিলো।

নিখুঁত কারিগরী বিদ্যায় ভাঙা পা এমনভাবে জুড়ে দিলো যে লোকে বুঝতে পারলো না কোনদিন বিগ্রহের পা ভেঙেছে

ওদিকে ভাস্কর নিয়ে এলো নতুন বিগ্রহ। তুলে দিলো মথুরবাবুর হাতে।

মথুরবাবু সেটি গদাধরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই নতুন মূর্তিটি কি সেই মূর্তির মত হয়েছে ?

গদাধর দু'টি মূর্তি প্রাণভরে দেখলো। তার মনে শ্রীরাধার ভাব হলো। চীৎকার করে বলে উঠলো, ঠিক হয় নি।

পরে মথুরবাবু নতুন মূর্তিটি সিন্দুকে তুলে রাখলেন। কিন্তু বর্তমানে আবার ওটিকে সিন্দুক হতে বের করে পূজো করা হচ্ছে। কারণ পুরোনো বিগ্রহের ভাঙা পা খুলে গেছে। তাকে অন্যত্র সরিয়ে রেখে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরোনো মূর্তিটি এখন বিষ্ণুমন্দিরের উত্তর দিকের ঘরে যত্নসহকারে রাখা হয়েছে।

রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ তো ঠিক হয়েছে। এখন তার পূজোর ভার নেবে কে ? মহাচিন্তায় পড়লেন মথুরবাবু।

শেষকালে চিন্তামণি কাটালেন চিন্তার ভার।

গদাধরের কথা মনে পড়ে গেল মথুরবাবুর। তিনি গদাধরকে বললেন, বাবা, আপনি রাধাগোবিন্দের পূজোর ভার নিন আর হৃদয় নিক আপনার কাজ।

গদাধর রাজী হলো। এখন থেকে সে হলো রাধাগোবিন্দের পূজারী আর হৃদয় মা ভবতারিণীর সাজকর।

এভাবে ছ'মাস কাটলো। রাধাগোবিন্দকে নিয়ে গদাধর বেশ আনন্দেই আছে।

হঠাৎ মথুরবাবু একদিন গদাধরকে ডেকে বললেন, বাবা, তোমায় দয়া করে শ্যামাপূজোর ভার নিতে হবে।

গদাধর বললে, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে। শাস্ত্রমতে পূজো করবো কিভাবে ?

বাবা, তোমার যে ভক্তি, সেই ভক্তিতেই মাকে বেঁধে ফেলবে।

তোমার পূজোয় মন্ত্রতন্ত্রের দরকার নেই। তুমি ভক্তিভাবে যা বলে পূজো করবে মা তাই সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করবেন।

গদাধর তাই শুনে আনন্দে নাচতে থাকে। ভবতারিণীর পূজো ভক্তিতেই তো সম্ভব। শাস্ত্রপাঠ আর শাস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করলেই কি মায়ের পূজো করা হয়!

গদাধরের আছে ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি। তাই হবে তার পূজোর শ্রেষ্ঠ সম্বল।

রামকুমার গদাধরকে শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। এখন থেকে তিনি হলেন রাধাগোবিন্দের সেবক আর গদাধর হলো মা ভবতারিণীর।

গদাধর গান গেয়ে তন্ময়ভাবে ভবতারিণীর পূজো করতো। গানই তার একমাত্র সম্বল। ফুল আর গান—বনের তাজাফুল আর অন্তরের সরল গান এই দুই নিষ্পাপ সুন্দর বস্তু দিয়ে নিত্য পূজো করতো মাকে। বড় আনন্দ পেত সে। যে দেখতো সেই মুগ্ধ হতো। পূজোর সময় কাছে কেউ এলে বুঝতে পারতো না গদাধর।

এমনি তন্ময় হয়ে যেত সে। মনটাকে মাতে এমনিভাবে সমর্পণ করলেই তো আদর্শ পূজো হয়। মনই তো সব। মন তোর। মন্ত্রের অর্থই তো তাই।

যে দেখছে গদাধরের পূজো সেই বলছে, আহা, এ যে মানুষ নয়! স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব নরদেহ ধারণ করে এসেছেন।

প্রতিদিন ভবতারিণীর পূজো করে গদাধর। হৃদয় মাকে সাজিয়ে দেয়। গদাধর মাকে পূজো করে। বেশ আনন্দ পায় পূজোতে।

পূজোর সময় গানও গায় গদাধর। তার প্রিয় গান,—

'কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।' এই গানটি

গদাধরের অতি প্রিয়। রাণী রাসমণি এই গানটা শুনতে বড় ভালবাসতেন। প্রায়ই মন্দিরে এসে মায়ের গান শুনতেন গদাধরের মধুরকণ্ঠে।

গদাধর গান গায়, পূজো করে। কখনো বা তন্ময় হয়ে ধ্যানে বসে। ধ্যান করতে করতে ভাবে বিভোর হয়। সর্বাঙ্গ পাথরের মত অনড় হয়ে ওঠে। ধ্যানে বসে গদাধর দেখে ত্রিশূল হাতে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। মূর্তি যেন তার কাছে এসে বলছে, একমনে ধ্যান না করলে এই ত্রিশূলের বাড়ি দেবো।

গদাধর মা ভবতারিণীকে পূজো করে। কিন্তু শাস্ত্রে আছে— শক্তিদীক্ষা না হলে তন্ত্রোক্ত পূজোতে অধিকার আসে না। তাই গদাধর মন্ত্র নেওয়ার জন্যে অস্থির হলো।

কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলে তখন এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কেনারাম ভট্চাজ্ থাকতেন। তাঁর কাছে প্রথম দীক্ষা নিলো গদাধর।

কেনারাম নির্দিষ্ট দিনে গদাধরের কানে মন্ত্র দিলো। অমনি গদাধরের মধ্যে এলো পরিবর্তন।

গদাধর লাফিয়ে উঠে শিবের ওপর দাঁড়ালো। মা ভবতারিণীকে জড়িয়ে ধরলো।

পরে ভাবসংবরণ হলে কেনারাম তাকে আশীর্বাদ করে বললে, তোমার হবে। তুমি এই জীবনে ইস্টলাভ করে মহাসাধক হবে।

নবতঘরের উত্তরে জঙ্গল। সেখানে ছিল একটা আমলকী গাছ। গদাধর রাতে ও দিনে সেখানে এসে ধ্যান করতো। দীক্ষার আগে থেকেই সেখানে যাওয়া-আসা ছিল।

দিনের বেলায় কর্মমুখর দেবালয়-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে মাঝে মাঝে এই জঙ্গলে চলে আসতো গদাধর। আমলকীতলায় আসন করে মায়ের ধ্যানে বসতো।

মামাকে মন্দিরে না দেখতে পেয়ে পাগল হলো হৃদয়। হাঁক ছাড়লো, মামা, ও মামা—কোথায় গেলে ?

নীরব হয়ে ধ্যান করতো গদাধর। সাড়া দিতো না। কোনরকম শব্দও করতো না। একেবারে শিলার মত নিশ্চুপ নিস্তব্ধ।

পরে জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এলে হৃদয় বললে মামাকে, তুমি ওর মধ্যে এতক্ষণ কি করছিলে ?

এবারও নীরব রইলো গদাধর। উত্তর দিলো না। রাত্রিবেলায়ও যখন জঙ্গলে যেতো হৃদয় পেছন দিক হতে ঢিল ছুঁড়তো। তার মনের ভাব এই যে মামা ভাববে ভূতের কাণ্ড। তাই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসবে। কিন্তু গদাধর তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লো না। মাতৃভাবে যুক্ত মন অত সহজে কি নড়চড় হতে পারে! কেবলমাত্র হৃদয়কে বললে, তুই অমন করিস কেন ?

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গদাধর আমলকীবনে এসে ধ্যান করতো। একেবারে উলঙ্গ হয়ে ধ্যান। ধ্যানের শেষে কাপড় ও পৈতে পরে বেড়িয়ে আসতো অরণ্য হতে।

তাকে বেড়িয়ে আসতে দেখে একদিন হৃদয় জিজ্ঞেস করলো, মামা, তুমি সন্ধ্যের পর কোথায় যাও ?

ওখানে একটা আমলকী গাছ আছে। তার তলায় বসে ধ্যান করি। সেখানে বসলে আপনি ধ্যান হয়। আমার মনে হয় সেখানে যে যা মনে করে ধ্যান করে তার তা সিদ্ধ হয়, বললে গদাধর।

একদিন হৃদয় সন্ধ্যের পর আমলকীতলায় এসে দেখলো, মামা উলঙ্গ হয়ে ধ্যান করছে। গায়ে পৈতে নেই, কাপড়ও নেই।

হৃদয় গর্জে উঠলো, কি হচ্ছে ? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে ন্যাংটা হয়ে বসে যে ?

ধ্যানমগ্ন গদাধর। তাই প্রথমে কোন কথা বললো না। ধ্যান

ভাঙ্‌তে বললো, তুই জানিস নি। ঐরকম করে বালকের মত হয়ে জগদম্বার ধ্যান করতে হয়। আমি এখনি আবার সব পরছি।

হৃদয় কিন্তু মামার ওকাজ সমর্থন করতে পারলো না। ভাবলে, মামা ঠিক পাগল হয়েছে। তা না হলে এমনধারা কাজ করবে কেন?

মামার ওপর অত্যাচার চালাতে লাগলো। দূর থেকে প্রতিদিন ঢিল ছুঁড়তো।

তার অত্যাচার নীরবে সহ্য করলো গদাধর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধ্যান করতো গদাধর। তার সঙ্গে আরও একটি কাজ করতে লাগলো।

সাধুর চিত্ত হবে নিরহঙ্কার। তাই মনের অহং নাশ করার জন্যে গদাধর প্রতিদিন চাকরের কাজ করতে লাগলো। নিজের হাতে পায়খানা পরিষ্কার করা, এঁটো পাতা কুড়নো ইত্যাদি কাজও করে। কালীবাড়িতে বহুলোক এসে মায়ের প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে। এঁটো পাতা ফেলে যাচ্ছে। সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতো গদাধর। নিজের হাতে সান পরিষ্কার করতো। মাথার বড় বড় চুল দিয়ে মেঝ মুছতো।

এমনি করে বিনাশ করলো মনের অহংভাবকে।

নিত্য মায়ের পূজো করতো গদাধর। ও আবার বিধিবদ্ধ পূজো নয়, সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত।

মন্ত্র আর আসন, কোশাকুশি আর গঙ্গাজল ঐ পূজোর সার বস্তু নয়। ঐ পূজোতে ছিল ভক্তির নিস্তরঙ্গ সমুদ্র।

মাকে ফুল দিয়ে সাজাতো, মায়ের সামনে বসে গান গাইতো। নৈবেদ্যর থালা নিয়ে বলতো, খেয়ে নে, খা—খা না।

মাও নাকি খেতেন। কখনো কখনো পূজোর আগেই খেয়ে ফেলতেন। তাই নিয়ে গদাধরের অনুযোগের আর অন্ত থাকতো না।

অভিমান করে বলতো, একি ! এর মধ্যেই খেয়ে নিলি ! ভোগ না দিতেই। এত লোভ কেন ? তোর কি এতটুকু সংযম নেই ?

মাও কিছু বলতেন না। কেবল হাসতেন। সন্তানের আবদার —ভক্তের পাগলামী দিব্যানন্দে হৃদয়ঙ্গম করতেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গদাধর কাটাতো মাকে নিয়ে। মন্দিরের লোকজন ভাবলো, ঠাকুর পাগল হ'লো নাকি। মন্দির থেকে বাইরে আসে না কেন ? তাছাড়া ওর পূজোই বা কি রকম ! মায়ের পায়ে ফুল-বেলপাতা না দিয়ে নিজের মাথায় দিচ্ছে কেন ?

তাদের মনঃপূত হলো না গদাধরের পূজো। তারা ভাবলো, এ পূজো নয়, স্রেফ্ ভড়ং—পাগলামি।

সকলে এলো খাজাঞ্চির কাছে। নালিশ জানালো গদাধরের বিরুদ্ধে।

খাজাঞ্চি আর স্থির থাকতে পারলো না। দলবল নিয়ে চলে এলো মথুরবাবুর কাছে। নালিশের সুরে বললে, বাবু, পুরুতঠাকুর মাকে ঠিকমত পূজো করেন না। আপনি যদি মন্দিরে যান তাহলে ওর কাণ্ড দেখে অবাক্ হবেন। এমনিভাবে পূজো করলে আপনার পুণ্যি না হয়ে ক্ষতিই হবে।

খাজাঞ্চির কথা শুনে মনে মনে রেগে উঠলেন মথুরবাবু। এলেন মন্দিরে গদাধরের পূজো দেখবার জন্যে।

মন্দিরে এসে দেখলেন, গদাধর দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে মায়ের স্তুতিগান করে চলেছে। সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

মথুরবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাত-জোড় করে নমস্কার করলেন গদাধরকে।

শান্তভাবে মন্দির থেকে চলে এলেন।

আসার সময় খাজাঞ্চিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, আজ থেকে তোমরা বাবাকে কিছু বলো না। ওখানে অমনিভাবে পূজো করতে দাও। উনি যা চান তাই করুন।

সকলে মথুরবাবুর নির্দেশ শুনে অবাক্ হ'লো। বিস্মিত হয়ে ভাবলো, একজন উন্মাদ পুরুতের ওপর বাবুর এত দরদ কেন ?

যা হোক ওরা আর গদাধরের বিরুদ্ধে কোন কথা বললো না।

সমস্ত দিন ভাবাবস্থায় কাটতো গদাধরের। তাই সে ঠিকমত পূজো করতে পারতো না মাকে। মথুরবাবু তাই একজন পূজারী খুঁজতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হৃদয় মামাকে পূজোর সময় সাহায্য করলো।

হৃদয় বললে, মথুরবাবু রামকৃষ্ণের এই অপরূপ পূজো দেখার জন্যে আবার একদিন মন্দিরে এসে বসলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে রামকৃষ্ণ আমার হাত ধরে পূজকের আসনে বসিয়ে দিলেন। মথুরবাবুকে বললেন, আমি পূজো করলেও যা হবে হৃদে পূজো করলেও তা হবে।

মথুরবাবু দ্বিরুক্তি না করে পরে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। যা হোক তুমি একজন পণ্ডিতের কাছে পূজোর পদ্ধতিগুলি পড়ে নিও।

আমি তাই করি। পূজোর সময় মামা কাছে থাকেন। আমি তাঁকে নিজের দক্ষিণ দিকে বসিয়ে অর্ঘ্যপুষ্প দিয়ে মামা ও কালীকে অভেদজ্ঞানে পূজো করেছি।

এই সময় গদাধরের খুড়তুতো ভাই রামতারক মা ভবতারিণীর পূজক হ'লো। গদাধর তাকে হলধারী বলে ডাকতো।

কিন্তু হলধারী পরম বৈষ্ণব। তাঁর পক্ষে কালীপূজো করা সম্ভব হয় নি। তাই কিছুদিন কালীঘরে কাজ করার পর তিনি রাধা-গোবিন্দের পূজোর ভার নেন।

ইদানীং গদাধরের মনে এলো বেপরোয়া ভাব। শক্তির প্রকাশ হলে ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে এমনি বীরভাব জাগে।

গদাধরের চোখ দুটো লাল জবাফুলের মত। শরীরের দিকে বেশি নজর নেই। যে দেখছে সেই ভাবছে, লোকটা নেশাটেশা করেছে নাকি!

রাসমণি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। এসে ঠাকুরের কণ্ঠে দু'-একটি শ্যামাসঙ্গীত শুনতেন। তারপর মা ভবতারিণীকে প্রণাম জানিয়ে চলে আসতেন নিজের বাড়িতে।

একবার রাণী এলেন দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের কণ্ঠে মিষ্টি গান শোনার জন্যে।

গান শোনালো গদাধর,—

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ ডুব্ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন॥'

ঠাকুর পুনরায় কাফী সুরে ঠুংরী তালে অন্য একটি গান গাইতে লাগলেন,—

'কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥'...

কিন্তু রাণীর সেদিকে খেয়াল নেই। গদাধর আপনার খেয়ালে গান গাইতে লাগলো।

কিন্তু অন্তর্যামী গদাধর বুঝতে পারলো রাণীর মনোভাব। অমনি তাঁর গালে একটি চড় বসিয়ে দিলো।

তাই দেখে রাণীর লোকজন ক্ষেপে উঠলো। গদাধরকে মারতে গেল।

রাণী তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, থাক থাক, ওঁকে কিছু বলো না। দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি তখন নিজের মধ্যে ছিলুম না। কি একটা বিষয়ের কথা চিন্তা করছিলুম।

রাণীর কথা শুনে শান্ত হলো তাঁর অনুচরবৃন্দ।

ঐ ভাব-প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলেছেন, উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক্ কথা বলতুম। কাউকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলুম, জয় মুখুজ্যে জপ করছে। কিন্তু অন্য-মনস্ক। গিয়ে এক চাপড় দিলুম।

একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এলো। কালীঘরে প্রবেশ করলো। পূজোর সময় মাঝে মাঝে আসতো আর দু'-একটি গান গাইতে বলতো। গান গাচ্ছি—দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্‌ছে। অমনি এক চাপড়। তখন হলধারীকে বলি, দাদা, একি স্বভাব হলো—কি উপায় করি! মাকে ডাকতে ডাকতে ও স্বভাব গেল।

এমনিভাবে মাতৃপ্রেমে পাগল গদাধর অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের পাগল বামুন দিনে দিনে আধ্যাত্মিক জগতের মহিমময় মানবরূপে উত্তর-জীবনে প্রখ্যাত হন। তখন তাঁর নাম হলো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বহু সিদ্ধ সাধকের কাছে পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সুউচ্চ অনুভূতি লাভ করেন এবং তা স্বীয় জীবনে যথাযথ প্রয়োগ করে আশুফল পেলেন। দেশবাসীকে শোনালেন তার মহিমা। ক্রমে তাঁকে এবং তাঁর সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরকে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন ভক্ত এবং দেশবিখ্যাত মনীষীদের অর্বিভাব হ'লো। তারা সকলে গদাধরকে একবাক্যে যুগাবতার বলে মেনে নিলো। এই যুগাবতারের বিভিন্ন

লীলার অংশীদার এবং সহায়ক হয়েছিলেন জানবাজারের রাণী রাসমণি। নররূপী নারায়ণের অপূর্ব লীলার প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করার মূলে ছিল রাণী রাসমণি এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জামাতা মথুরবাবুর অকৃপণ দান। আজও সমগ্র দেশবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হয়। মনে-প্রাণে গর্ববোধ করে।

মথুরবাবু ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ছোট ভট্‌চাজ বলে সম্বোধন করতেন। বড় ভট্‌চাজ বলতেন ঠাকুরের বড় ভাই রামকুমারকে। তিনি ঠাকুরকে নিয়ে কতবার কতভাবে পরীক্ষা করেছেন। ঠাকুর প্রত্যেকবার সেইসব কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

একবার মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে যান বেশ্যাপল্লীতে। সেখানে ঠাকুর বারাঙ্গনাদের দেখে 'মা' বলে সম্বোধন করলেন।

তখন মথুরবাবু অবাক্ হয়ে গেলেন। বুঝলেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁর কোনরকম সন্দেহ অতি বড় ভুল কাজ।

এমন কি বারাঙ্গনাগণ মথুরবাবুকে তিরস্কারের ভঙ্গীতে জানালো, একি করেছেন আপনি! এরকম একজন মহাপুরুষকে এখানে এনেছেন কেন?

আর একবার মথুরবাবু ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে দেবদেবীর প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

ঠাকুর তখন এক জায়গায় পায়চারি করছিলেন। মথুরবাবু দেখলেন, ঠাকুর যখন সামনের দিকে আসছেন তখন শিবের রূপ আবার যখন পেছন ফিরে অন্যদিকে যাচ্ছেন তখন কালীর মূর্তি।

তাই দেখার পর মথুরবাবু ভক্তিগদ্‌গদ-চিত্তে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। সেইদিন থেকে ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

আর একদিন মথুরবাবুর মনে একটা চিন্তা এলো। তিনি ভাবলেন, আর ক'দিনই বা বাঁচবেন। তাঁর অবর্তমানে ঠাকুরের সেবায় যাতে কষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। দশ হাজার টাকার এক সম্পত্তির নামে দলিল করে মথুরবাবু এলেন ঠাকুরের আছে। ভাবলেন, এই দানপত্রটি তিনি তুলে দেবেন ঠাকুরের হাতে।

ঠাকুর সেই কথা জানতে পেরে বাঁশ তুলে তাড়া করলেন মথুরবাবুকে—তবে রে শালা! আজ তোর মাথা গুঁড়ো করে ফেলবো। আমাকে বিষয়ী করতে এসেছিস! দাঁড়া—

মথুরবাবুর লোকজন হৈচৈ করে উঠলো। সকলে ঠাকুরের হাবভাব দেখে ভয় ও ক্রোধে কেমন যেন হয়ে গেল। পরে তারা ঠাকুরের দিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো।

মথুরবাবু তাদের থামিয়ে দিলেন। পরে সেই দলিলটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

ঠাকুর তখন বাঁশ নামালেন। তারপর বললেন সতেজে, তুই আমার ভার নিয়েছিস না আমি তোদের ভার নিয়েছি রে শালা?

এমনিভাবে ঠাকুর তাঁর অসীম কৃপাবলে মথুরবাবুর মন হতে সমস্তরকম অবিশ্বাস দূর করে দেন। মথুরবাবুর মনও দিন দিন ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

একবার মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা ভীষণ অসুখে ভোগেন। অনেক ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা হ'লো। তাঁরা দেখলেন রোগীকে দিনের পর দিন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রাণী রাসমণি আর মথুরবাবু দু'জনে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন জগদম্বাকে বাঁচাতে। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হ'লো। রাসমণি তখন চোখ বুজে প্রার্থনা নিবেদন

করলেন ভগবানের উদ্দেশ্যে। যতবার চোখ বুজলেন ততবারই দেখতে পেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তখন রাসমণি এই ব্যাপারটি জানালেন জামাতার কাছে। তাই শুনে মথুরবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তাঁকে দেখতে পেয়ে ঠাকুর বলে উঠলেন, ভাববার দরকার নেই। গিয়ে ছ্যাখোগে তোমার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করেছে।

মথুরবাবু ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। এসে দেখলেন যা দৃশ্য তাতে করে অবাক্ হলেন। দেখলেন, জগদম্বা বিছানা থেকে উঠে বসেছেন। তার অসুখ ভাল হয়ে গেছে।

ঐ দৃশ্য দেখে মথুরবাবু ঠাকুরের প্রতি ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে শ্রদ্ধা-নিবেদন করলেন। ভাবলেন, অশেষ তাঁর কৃপা—অহেতুকী তাঁর করুণা। যে রোগীকে একটু আগে সাহায্য না করলে পাশ ফিরে শুতে পারতো না, এখন সে ঠাকুরের কৃপাবলে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে বসেছে।

এখন থেকে মথুরবাবু এবং রাণী রাসমণি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

হালদার হচ্ছে জানবাজার জমিদার বাড়ির পুরুতঠাকুর। তাঁর মনটা বড় খলপূর্ণ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরবাবু, জগদম্বা এবং রাসমণির অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাব দেখে হিংসুটে হালদার রাগে জ্বলেপুড়ে মরতো। ভাবতো, আমি কুলপুরোহিত। কোথায় আমার প্রতিপত্তি হবে বেশি তা না হয়ে একজন কোথাকার কে একটা পাগল এসে জানবাজার রাজবাড়ি দখল করে বসলো। সে ভাবলে, নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ তুক-তাক জানে। তা না হলে সে কিভাবে রাণীমা এবং তাঁর মেয়ে-জামাইকে বশ করলো। হালদার ভাবলে, যেমন করে হোক

একদিন ঐ পাগলটার কাছ থেকে তুকতাকের বিদ্যেটা রপ্ত করে নেবে।

কিন্তু তাকে নির্জন জায়গায় একলা পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে হালদার পুরুত।

অবশেষে এসে গেল সেই মহাসুযোগ। রামকৃষ্ণ বসে আছেন জানবাজার রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। তন্ময় ভাব।

হালদার সেই সুযোগে তেড়ে এলো তাঁর কাছে, এই বিট্‌লে বামুন!

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁর মধ্যে তন্ময় ভাব।

হালদার সে-সব গ্রাহ্য করলো না। সে দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বললে, বটে! আমরা বুঝি মানুষ নয়, না! রাজা-রাণী না হলে বুঝি কথার যুগ্যি নয়।

একটু থেমে আবার বললে, এই বিট্‌লে বামুন, বল্ না কি করে বাগালী বাবুটাকে?

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর।

হালদার পুনরায় বললে, কিরে কথা শুনছিস না? একা খাবি সব? আমাদের ভাগ দিতে হবে। না হলে তোর ব্যবসার আমি গণেশ উল্টে দেবো। জানিস, আমি এ বাড়ির পুরুত।

এবারও রামকৃষ্ণ নিরুত্তর। একটি কথাও বললেন না।

তখন হালদারের রাগ চরমসীমায় উঠলো। মারধোর করা শুরু করে দিলো, বলবি নে শালা! তবে ছ্যাখ।

এই বলে রামকৃষ্ণকে ধাক্কা দিয়ে মেজেয় ফেলে দিয়ে লাথি মারতে মারতে বললে, ছ্যাখ শালা কেমন লাগে।

যাবার সময় শাসিয়ে গেল, যদি সেজবাবুর কাছে নালিশ করেছিস কি মরেছিস। তোকে আর এখান থেকে ফিরতে হবে

না। মনে রাখবি, আমি হালদার ঠাকুর। তোর মত ঢের বিট্‌লে বামুন দেখেছি।

এই বলে হালদার রাগে গড়গড় করতে করতে চলে গেল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিছু না বলে মাটি থেকে উঠে বসলেন। কাউকে হালদার পুরুতের ক্রিয়াকাণ্ড প্রসঙ্গে কোন কথা জানালেন না।

কিন্তু পাপ কি গোপন থাকে! রাণী শুনলেন, শুনলেন মথুরবাবু।

মথুরবাবু ঠাকুরকে ভক্তি করেন। তাঁর অসম্মান হতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। দৌড়ে ঠাকুরের কাছে এসে জানালেন, বাবা! এসব কি শুনছি? হালদার আপনাকে লাথি মেরেছে? আজ ওর মাথা কেটে আদি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব তবে আমার নাম মথুর।

মথুরবাবুর কথা শোনামাত্র রামকৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তাইতো বলি নি, সেজবাবু। যাই করে থাক—লোকটা রাগের বশেই করেছে। রাগ পড়লে বুঝবে। মানুষ তো! ও রাগলে বলে কি আমিও রাগবো?

ঠাকুরের কথা শুনে শান্ত হলেন না মথুরবাবু। সরোষে বললেন, যাকে ইষ্টজ্ঞানে ভক্তি করি তার গায়ে হাত! তার চেয়ে আমাকে দু'ঘা দিলেও আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতুম। বাবা আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না।

রামকৃষ্ণ তখন স্মিতমুখে মথুরবাবুর গায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, সেজবাবু, মানুষ—মানুষ। তাকে ভালবাসাই ধর্মকর্ম—সাধনভজন সব। শত্রুকে বশ করবে ভালবাসা দিয়ে। রাগকে দমন করবে প্রেম দিয়ে। তুমি ওকে কিছু বলো না। তাহলে আমি দুঃখ্যু পাবো।

ঠাকুরের কথা শুনলেন মথুরবাবু। তাঁর কৃপায় হালদার পুরুত সে যাত্রায় রক্ষা পেল।

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

প্রথমে এলেন দেওঘরে। এখানে বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করে পরে যাবেন কাশীতে।

তখন দেওঘরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। চারদিকে পেটের জ্বালা, চারদিকে হাহাকার। দলে দলে সাঁওতালরা ক্ষুধাতুর হয়ে ভিক্ষে করছে লোকদের দ্বারে দ্বারে।

সে মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

মথুরবাবুকে বললেন, সেজবাবু, তুমি তো মায়ের দেওয়ান। এরাও মায়ের ছেলে। ওদের পেট ভরে খেতে দাও, মাথায় তেল দাও—পরবার কাপড় দাও।

মথুরবাবু বললেন, এখন এই পথের মাঝখানে টাকা কোথায় পাবো বাবা? তীর্থে চলেছি। কখন কোথায় কি লাগে কে জানে? হাতের টাকা খরচ করলে পরে হয়তো অনেক জায়গা যাওয়া হবে না।

রামকৃষ্ণ বললেন, তবে তোমরা যাও। আমি এদের সঙ্গে থাকবো। এদের মাঝেই তিনি আছেন। এদের হাত দিয়েই দেবতা পূজা নেন, এদের মুখ দিয়েই আহার গ্রহণ করেন। তোমরা যাও—আমি আমার ঠাকুরের কাছে থাকি।

ঠাকুরের কথা শুনে মুস্কিলে পড়লেন মথুরবাবু। অনেক ভাবলেন। কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে মনে মনে বললেন, যা কর ঠাকুর তুমি করবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এর পর ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন মথুরবাবু। সাঁওতালদের

মাথায় তেল দিলেন। তাদের নগ্নদেহে কাপড় দিলেন। তারপর তাদের পেটভরে খাওয়ালেন।

তাই দেখে খুশী হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ক্ষুধার্ত সাঁওতালরা পেটভরে খেতে পেয়ে মথুরবাবুকে করজোড়ে আশীর্বাদ জানালো।

সাক্ষাৎ দেবতারা তুষ্ট হয়েছে দেখে ঠাকুর আনন্দে হাততালি দিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

ধন্য তিনি আর ধন্য তাঁর সেবক মথুরবাবু। নররূপী নারায়ণ এসেছেন নরের সেবা দেখতে এবং সেবা নিতে। আজ তা পূর্ণ হ'লো। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রিয়তম এবং প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বময় প্রেমধর্ম এবং সেবাভাব প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥'

পূর্ববাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আরম্ভ হলো। পাবনা, যশোর, রংপুর, ফরিদপুর অঞ্চলের লোকেরা বিশেষভাবে পীড়িত হয়ে দেশত্যাগ করে ধনীদের কাছে এসে আশ্রয় নিলো।

মকিমপুরে ছিল রাণী রাসমণির জমিদারী। সেখানকার প্রজারা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁর বাড়িতে এলো।

রাণীর কাছে এসে নিজেদের দুঃখের কথা জানালো। বললে, আপনি আমাদের মা-বাপ। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে আমরা ব্যতিব্যস্ত।

রাণী মন দিয়ে শুনলেন প্রজাদের দুঃখকষ্ট। তাদের আশ্বস্ত করে বললেন, তোমরা পরগনার সদর কাছারিতে বাস করতে

থাকো। তোমাদের যাতে কোনরকম বিপদ না হয় তার জন্যে পঞ্চাশজন দারোয়ান পাঠাচ্ছি।

রাণীর কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'লো প্রজারা। তাঁর কথামত পরগনার সদর কাছারিতে ফিরে গেল।

ওদিকে রাণী পরগনার প্রধান নায়েবের কাছে চিঠি লিখলেন, পরস্পর শুনছি, নীলকর সাহেবরা আমার প্রজাদের ওপর অত্যন্ত অত্যাচার করছে। তোমরা কেন এতদিন সরকারে সমাচার দাও নি। সম্প্রতি পঞ্চাশজন দারোয়ান পাঠাচ্ছি। যাতে কোনরকম গোলমাল না হয় সেই ব্যবস্থা করবে। প্রজা পুত্রসম। ওদের কষ্ট আমার সহ্য হবে না। যাতে তারা উৎপীড়িত না হয়, যাতে নীলকর সাহেবরা জব্দ হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করবে, কোনরকম শৈথিল্য দেখলে অন্যায় হবে।

বনমালী ঘোষ ছিলেন ঐ মকিমপুর পরগনার প্রধান নায়েব। তিনি রাসমণির চিঠি পেয়ে পরগনার অধীনে প্রধান প্রধান প্রজাদের ডেকে পাঠালেন।

প্রজারা এলো। তিনি তাদের কাছে রাণীর চিঠি পাঠ করে শোনালেন, তারপর আদেশ করলেন, নীলকর সাহেবরা যদি জোর করে নীলের দাদন দিতে আসে নেবে না। যদি বেশি ভয় দেখায় আমার কাছে আসবে। যা' করবার আমি করবো।

নায়েবের কথা শুনে প্রজারা শান্তি পেল। তারা আনন্দে স্বস্থানে ফিরে গেল।

অতঃপর তারা দৃঢ়মন নিয়ে স্থির করলো, তারা কেউই নীলের দাদন নেবে না।

যথাসময়ে নীলকর সাহেবরা এলো নীলের দাদন দেবার জন্যে।

প্রজারা সমস্বরে আপত্তি তুললো।

নীলকর সাহেবরা তখন ক্রোধান্ধ হয়ে মফঃস্বলের প্রজাদের কাছে আসতে লাগলো।

তারাও রাজী হলো না। তখন সাহেবরা বল প্রকাশ করতে লাগলো।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের খবরাখবর পৌঁছলো প্রধান নায়েবের কাছে।

তিনি হুকুম দিলেন, যে সাহেব আসবে তাকে সমুচিত শাস্তি দেবে। যত টাকা লাগবে সরকার দেবে।

নায়েবের হুকুম পেয়ে প্রজারা ক্ষেপে উঠলো। নীলকর সাহেব ডোলাল্‌ড দলবল নিয়ে একদিন প্রজাদের ওপর হামলা শুরু করে দিলো।

প্রজাদের ধরপাকড় করতে লাগলো। কিন্তু ক্ষিপ্ত প্রজারা সাহেব ও তার আমলাদেরকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করলো।

প্রচণ্ড মারধোর খেয়ে মৃতবৎ হলো ডোলাল্‌ড সাহেব।

মামলা শুরু হ'লো। নায়েব বনাম নীলকর সাহেব। মকদ্দমা ক্রমে যশোরের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এলো। রাসমণি কলকাতা হতে বড় বড় দু'জন ব্যারিষ্টার ও উকিল পাঠালেন।

অনেকদিন ধরে চললো ঐ মকদ্দমা। প্রচুর অর্থ ব্যয় হ'লো।

শেষকালে মকদ্দমা ডিসমিস হয়ে গেল। সেই থেকে আর নীলকর সাহেবরা অধিক উৎপাত করতো না। পরে বনমালী ঘোষের চেষ্টায় মকিমপুরে একটি ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হ'লো।

ঐ মকিমপুর পরগনায় মধুমতী নামে একটি নদী আছে। অন্যান্য নদীর সঙ্গে সম্মিলিত না থাকায় বাণিজ্যের বড্ড অসুবিধা হতো। প্রজারা সকলে একত্র হয়ে রাসমণির কাছে আবেদন জানালো।

প্রজাবৎসলা দয়াময়ী রাণী রাসমণি শুনলেন প্রজাদের মর্মকথা। তাঁর আদেশে ঐ নদীর কাজের জন্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার ও জরিপ

আমিন্ পাঠালেন। ওঁরা মধুমতী ও নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে খাল কেটে যোগাযোগ করে দেবেন। তখন বাণিজ্যের জন্যে আর বেগ পেতে হবে না।

ইঞ্জিনিয়ার বা আমিন পাঠিয়েও সুস্থির ছিলেন না রাসমণি। সঙ্গে সঙ্গে একটি চিঠি লিখলেন, কোন্খানে খাল কাটলে জনসাধারণের উপকার হবে ও তাতে বা কত অর্থ ব্যয় হবে এসব বিষয়ের একটি ফর্দ তাড়াতাড়ি পাঠাবেন।

যথাসময়ে উক্ত কর্মচারিগণ একটি ফর্দ পাঠালেন। ওতে প্রায় দশ হাজার মুদ্রার উল্লেখ ছিল।

রাসমণি মকিমপুরের সদর নায়েব বনমালীর প্রতি ঐ টাকা দিতে আদেশ করলেন।

নায়েব টাকা দিলেন। যথাসময়ে খাল খনন করা শেষ হলো। এই খাল 'টানার খাল' নামে বিখ্যাত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম কোন সময়েই ঐ খালের জল কমে বা মজে গেল না। সর্ব অবস্থাতেই বেগবতী রইলো। ওখানকার জনসাধারণ মহাসুখে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে লাগলো আর রাণীর সহৃদয়তার স্তুতিগান শোনালো।

জামাতাদের হাতে নিজের জমিদারীর কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকেন নি রাণী রাসমণি। মাঝে মাঝে নিজে সেই সমস্ত কাজের তদারক করতেন। বিশেষ করে টাকা-পয়সার ব্যাপারে।

একবার জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস একটি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। টাকাপয়সার হিসাবে গোলমাল থাকায় রাণী তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। মথুরামোহন তার সদুত্তর দিতে পারলেন না।

ফলে রাণী তাঁর কাজের গাফিলতির জন্যে তাঁকে যথোচিত ভর্ৎসনা করলেন। মথুরামোহন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সপরিবারে ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে রইলেন।

পরের বছর রাণী গেলেন ত্রিবেণীতে স্নান করতে। স্নান সেরে বাড়ি ফেরবার পথে লোকজনকে আদেশ দিলেন, আমি একবার ফরাসডাঙ্গায় নামবো। তোমরা আমার জন্যে প্রস্তুত থেকো।

রাণীর আদেশমত তাঁর লোকজনেরা ফরাসডাঙ্গায় নামলো। রাণী এলেন জামাতা মথুরামোহনের বাড়িতে। তাঁকে ক্ষমা করলেন এবারের মতো। বললেন, কলকাতায় চলো। তোমাকে এখানে আর থাকতে হবে না।

রাণীর কথা রাখলেন মথুরামোহন।

এমনিভাবে কি পর কিংবা আপনজন কারও চরিত্রে বিন্দুমাত্র দোষ দেখলে রাণী তার সমালোচনা করতেন এবং তা সংশোধন করার জন্যে দোষীকে উপযুক্ত সুযোগ দিতেন।

কৃষ্ণকান্তের দেশ ছিল ওড়িষ্যা প্রদেশের একটি গণ্ডগ্রামে। সে ছিল রাণী রাসমণির অন্যতম ভৃত্য।

সৌদামিনী নামে অন্য এক চাকরানী ছিল রাণী রাসমণির।

একসময় কৃষ্ণকান্ত সৌদামিনীর প্রেমে পড়ল।

তাদের প্রেমের কাহিনী রাণীর কানে গেল। রাণী তখন কৃষ্ণকান্তকে ডেকে পাঠালেন।

কৃষ্ণকান্ত কাচুমাচু হয়ে হাতজোড় করে রাণীর কাছে এসে দাঁড়ালো। রাণী বুঝতে পারলেন তার মনোভাব। তার হাবভাব দেখে মনে হলো, যেন সে কত বড় অপরাধ করে ফেলেছে।

রাণী মৃদুস্বরে বললেন, কৃষ্ণকান্ত! আমি সব শুনেছি। তুমি কি সৌদামিনীকে ভালবাস?

মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কৃষ্ণকান্ত। রাণীর কথার উত্তর দিতে পারলো না।

রাণী বুঝতে পারলেন, তাঁর কথা শুনে লজ্জা পেয়েছে কৃষ্ণকান্ত।

তিনি পুনরায় বললেন কৃষ্ণকান্তকে, তুমি সৌদামিনীকে ভালবাস সে তো উত্তম কথা। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, তুমি ওকে বিয়ে করো। তবে তার আগে একটা সর্ত হ'লো, বিয়ের পর কোনদিন তুমি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে না। কেমন রাজী?

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

নির্দিষ্ট দিন দেখে রাণী রাসমণি বিয়ে দিয়ে দিলেন কৃষ্ণকান্তের সৌদামিনীর সঙ্গে।

ওরা দু'জনে কলকাতাতেই রইলো। যতদিন রাণী জীবিত ছিলেন ততদিন ওরাও তাঁর কাছে ছিলো। পরে রাণী সজ্ঞানে দেহত্যাগ করলে ওরা স্বদেশে ফিরে গেল। পরমানন্দে ঘরসংসার করতে লাগলো।

১৮৫৭ সালে ভারতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় কাল। এই সালে ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহের দাবানল চারদিকে জ্বলে উঠলো। কলকাতাতেও ওর তাণ্ডবনৃত্য শুরু হলো।

নগরের প্রত্যেকটি প্রধান স্থানে সৈন্য এসে শিবির সংস্থাপন করতে লাগলো।

এই সময় সকলেই নিজের নিজের কোম্পানীর কাগজ বিক্রী করতে লাগলো। কেননা সকলের মনে এই ধারণা জন্মাল যে

অচিরে সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ভারত থেকে কোম্পানীকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।

অনেকে রাসমণিকে সমস্ত কাগজ বিক্রি করতে পরামর্শ দিলো।

বুদ্ধিমতী রাণী রঞ্জিত সিংহের কথা উদ্ধৃত করে বললেন, সিপাহীদের কুবুদ্ধি মাত্র। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি সব লাল হোয়েগা।

রাসমণি নিজের কাগজ বিক্রি না করে বরং আরও কিনলেন। বিদ্রোহানল ক্রমে বেড়ে গেল। কলকাতার অনেক বড় বড় লোক গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করলেন। রাণী রাসমণিও দু'টি হাতী, বিস্তর খাদ্য ও অর্থ সাহায্য করলেন। তাঁর সাহায্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সরকার একখানি প্রশংসাপত্র দিলেন।

ওদিকে ইংরেজ-সরকার নিয়ম করলেন, বিকেল চারটের পর কেউ দোকান খুলে রাখতে পারবে না। এতে করে কলকাতার দোকানীরা বড় বিব্রত বোধ করলো। বিশেষ করে জানবাজার কলকাতা দুর্গের কাছে বলে ওখানকার লোকেরা সবচেয়ে বেশি পীড়িত হ'লো।

একদিন অপরাহ্নে রাসমণির দৌহিত্রেরা নিজের নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বারান্দায় বসে আছেন এমন সময় কয়েকটি গোরা সৈন্য ফ্রি স্কুল হতে বেরিয়ে রাসমণির বাড়ির সামনে কয়েকটি দোকানে প্রবেশ করে উৎপাত আরম্ভ করলো।

দোকানীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাবুদের শরণাগত হ'লো। রাসমণির দৌহিত্র যদুনাথ ও দ্বারিকানাথ আপন দারোয়ানদিগকে আদেশ দিলেন, দুরাত্মাদের তাড়িয়ে দাও।

দারোয়ানরা যষ্টি প্রহার করে তাড়িয়ে দিলো গোরা সৈন্যদের।

গোরারা মারধোর খাবার পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল তাদের কর্ণেলের কাছে।

তাদের কর্ণেল থাকতেন ফ্রি স্কুলে।

কর্ণেলের কাছে এসে সব ব্যাপারটি বিস্তৃত করে বললো।

কর্ণেল রাগে অন্ধ হয়ে এক রেজিমেণ্ট সৈন্যকে আদেশ দিলেন, তোমরা এখনি তৈরী হও।

অতঃপর কর্ণেল বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় সুযোগ বুঝে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ির সামনে।

বাড়ি ঘেরাও করবার আদেশ দিলেন। তারপর রেজিমেণ্টের একাংশ হতে সৈন্যসামন্তরা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করলো। বাড়ির নীচে যেসব দামী দামী জিনিস ছিল সেগুলি ভেঙে তছনছ করতে লাগলো।

এবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

বাড়ির মেয়েছেলেদের আগে থেকেই অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হ'লো। একটা প্রাচীর ভেঙে পাশের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হ'লো। মেয়েরা নিরাপদ স্থানে চলে গেল। একমাত্র রাণী রাসমণি রইলেন জানবাজারে। তিনি নিরাপদ জায়গায় গেলেন না। গোরা সৈন্যদের দেখে ভয়ও করলেন না।

এমন সময় মথুরামোহন ফিরলেন জানবাজারে। তিনি বাড়ির সামনে সৈন্যদের ভিড় দেখে সোজা চলে এলেন থানায়।

থানায় এসে পুলিশ ইনস্পেক্টার ও সার্জেনকে ডেকে নিয়ে এলেন।

ওরা এসে কর্ণেলকে জানালে, এ বাড়িতে কোন বিদ্রোহী নেই। থাকলে আমরা খুঁজে বের করবো। আপনারা নির্বিঘ্নে প্রস্থান করতে পারেন।

তখন কর্ণেল বিগল বাজাল। বিগলের বাজনা শুনে সৈন্যরা রাণীর ভবন ত্যাগ করে প্রস্থান করলো।

এর পর থেকে যতদিন বিদ্রোহ চালু ছিল ততদিন রাণী বাড়িতে

কয়েকটি গোরা সৈন্য মোতায়েন করার বন্দোবস্ত করেন। প্রায় দু'বছর যাবৎ ঐ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। রাণী নিজের খরচায় পুরো দু'বছর ওদের খাওয়ানোর ভার নেন। বাড়ির গোলমাল থাকতে রাসমণি নিজে মথুরামোহনকে নিয়ে সমস্ত গৃহ পর্যটন করলেন।

জিনিসগুলি ভাঙা দেখে তিনি ব্যথিত অন্তঃকরণে বললেন, এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।

তারপর আহত ভৃত্যদ্বয়কে দেখে সকরুণ হৃদয়ে আপনি নিজের হাতে তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে রাসমণি দুর্জনদের শাস্তি দিতে কৃত-সংকল্প হয়ে তার পরদিন সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করলেন।

তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হ'লো। অনেক অর্থ ব্যয় করে রাসমণি জয়লাভ করলেন।

ইংরেজরা অনেক চেষ্টাচরিত্র করে সিপাহী-বিদ্রোহ কমিয়ে দিল বটে কিন্তু তার ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হ'লো এদেশের জনসাধারণকে।

কিছুদিন পরে ইন্‌কাম-ট্যাক্স নামে একটি কর নির্ধারিত হ'লো। এই কর-গ্রহণকারীদের পীড়নে প্রজারা হাহাকার করতে লাগলো। তারা রাসমণির কাছে এসে অনুনয়-বিনয় করে জানালে, আপনি আমাদের রক্ষে করুন। আমরা গরীব মানুষ। আমরা আপনাকে জানি। আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হতে বাঁচান। আপনি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে বলুন।

রাণী তাঁর গরীব দেশবাসী এবং প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার

কথা শুনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হলেন। পরে তাদের উপদেশ দিলেন, তোমরা গভর্ণমেণ্টে আবেদন করো।

এদিকে তিনি আপন অধিকারের প্রত্যেক পরগনার সদর নায়েবের উপর এই আদেশ দিলেন যে, এই কর-গ্রহণকারীরা যাতে আমার প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার করতে না পারে সে বিষয়ে মনোযোগী হবে।

নায়েবেরা এসেসরদের পীড়নে কাতর প্রজাদের দুঃখ দূর করার জন্যে রাসমণির কাছে বারংবার সংবাদ পাঠাতে লাগলো।

রাসমণি তখন অনন্যোপায় হয়ে লিখে পাঠালেন, আমার প্রজাদের সাম্বৎসরিক যত টাকা ট্যাক্স লাগবে সমস্ত আপাতত আমার নিজের তহবিল হতে দান করো। পরে প্রজাদের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে আদায় করো।

রাসমণির এমন কৃপার পরিচয় পেয়ে প্রজারা তাঁর একান্ত বশীভূত হ'লো ও দেশবিদেশে তাঁর যশ-কীর্ত্তন করতে লাগলো।

অবশেষে সেই মহাদিন এলো। মানুষ মনে করে, সে চিরকাল সংসারে থাকবে। কিন্তু বিধাতা তা দেন না। তিনি নিযুক্ত করেছেন তাঁর প্রতিভূ মহাকালকে। মহাকালই নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের সংসারে অবস্থানকাল।

রাণী রাসমণির শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। অনেক কাজ করেছেন। এবার তিনি চলে যাবেন জগৎসংসার হতে অন্য এক সংসারে। সাঙ্গ হবে তাঁর পার্থিবলীলা।

একদিন হঠাৎ তাঁর জ্বরভাব দেখা দিলো। জ্বর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠলো। সেই জ্বরই বুঝি হ'লো কাল। একদিন তিনি হঠাৎ পড়ে যান। তারপর থেকে ঐ জ্বর হয়।

মথুরবাবু অনেক চিন্তায় পড়লেন। তিনি এখন কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। কোন বিষয়ের পরামর্শের দরকার হলে তিনি ছুটে আসতেন শাশুড়ীর কাছে। শাশুড়ীকে তিনি ঠিক নিজের মায়ের মত মনে করতেন।

রাণীর কোন ছেলে ছিল না। তাই তিনি মথুরবাবুকে নিজের ছেলের মত মনে করতেন।

মথুরবাবু অনেকদিন আগে চলে যেতে চেয়েছিলেন। স্ত্রী মারা গেলে তিনি বিদায় চাইলেন শাশুড়ীর কাছে। কিন্তু শাশুড়ী তাঁকে বিদায় দিলেন না। তিনি লোক চিনতেন। নিজের ছেলে নেই তাই ভরসা করলেন জামাই মথুরবাবুকে। সে চলে গেলে তাঁর ডান হাতটা যে সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যাবে।

মথুরবাবুকে যেতে না দিয়ে রাণী তাঁর অন্য এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। জামাইয়ের হাতে তাঁর সেজ মেয়েকে তুলে দিয়ে বললেন, মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি একে অন্য কার হাতে তুলে দেবো বলো? একে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলুম।

মথুরবাবু শাশুড়ীর কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। থেকে গেলেন শাশুড়ীর কাছে ছেলের মত হয়ে। সেই থেকে শাশুড়ীর প্রতি কাজটা যত্ন করে দেখাশোনা করেন। এখন তাঁর প্রিয় মাতৃসমা শাশুড়ী রোগশয্যায় শায়িত।

অনেকরকম চিকিৎসা করলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল পেলেন না।

কালীঘাটে মায়ের কাছ থেকে চরণামৃত এনে খাওয়ানো হ'লো রাসমণিকে। তাতেও কিছু হ'লো না। তিনি এখন কালীঘাটে মায়ের বাড়ির কাছেই আছেন। মাকে মনে মনে স্মরণ করছেন। মায়ের অষ্টশক্তির এক শক্তি তিনি—অষ্টসখীর অন্যতমা সখী।

মা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কিনা জানি নে। তবে তাঁর অবস্থার আর উন্নতি হ'লো না। দিন দিন তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

তাঁর প্রিয় ভক্তেরা দলে দলে এসে তাঁকে দর্শন দিতে লাগলো। তাঁর বাড়িতে দিবারাত্র লোকে লোকারণ্য। একদল যায় তো আর একদল আসে। এমনি করে বেশ কয়েকদিন চললো রাণীর বাড়িতে জনসাধারণের ভিড়। তিনি পুণ্যশ্লোকা বঙ্গেশ্বরী। তিনি মহিমময়ী নারী। তিনি লোকমাতা। লোকপাবনী শক্তি আছে তাঁর মধ্যে। তাঁর কর্মগুণে তিনি ধন্যা, স্বভাবগুণে তিনি বরণ্যা। দেশের লোক তাঁকে বলে রাণীমাতা। তিনি রাণী হয়েও ঐশ্বর্যের জাঁকজমকের অন্তরালে বিলাসব্যসনের মধ্যে ডুবে থাকেন নি। দীনহীনা নারীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছেন পল্লীবাংলার দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে, তাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর করবার ব্রত নিয়ে। তাই লোকে তাঁকে এত ভক্তি করে—পূজো করে লোকমাতারূপে। সেই লোকমাতা আজ রোগশয্যায়।

ঐ রোগশয্যায় শুয়ে অনেককে দেখা দিচ্ছেন রাণী। অশক্ত ও দুর্বল হাত তুলে অনেককে সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

দু'-একটা জরুরী ব্যাপারে মথুরবাবু রাণীর কাছে কাগজপত্র পেশ করছেন। তিনি অক্লেশে সেই সব কাগজপত্রে সই দিচ্ছেন। এই সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রে সই করেন। কিন্তু তিনি সই করলে হবে কেন? তাঁর সঙ্গে তাঁর যেসব উত্তরাধিকারী আছে সম্পত্তির, তাদেরও সইয়ের প্রয়োজন হয়।

রাণীর বড় মেয়ে বেঁকে বসলেন। তিনি কুটিল মন্তব্য করলেন, আমি সই দেবো না। মা কি সব দানধ্যান করে আমাদের পথে বসাবেন?

তাই রাসমণির মনে নেই শান্তি এবং সুখ। রোগশয্যায় শুয়েও

অশান্তি ভোগ করছেন। মা কালীকে মনে মনে স্মরণ করে ফিসফিস করে বলছেন,—কি হবে মা, পদ্মমণি তো সই দিলো না!

রাণী সব কাজ করেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সকল আশা পূর্ণ করেছেন। শেষের দিনে তাঁর এ আশা বুঝি পূর্ণ হ'লো না। এই অপূর্ণ আশা নিয়ে তঁকে যেতে হবে পরপারে। সেখানে গিয়ে কি তিনি শান্তি পাবেন?

তাই অহরহ তিনি ঐ একটি কারণের জন্যে মহা অশান্তি ভোগ করছেন। আর বেশি দেরি নেই। আর বেশিদিন তিনি থাকবেন না এই পৃথিবীতে। যে ক'টা দিন থাকেন সেই ক'টা দিন নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারিণী হবার জন্যে তাঁর আকুল স্পৃহার অন্ত নেই। বড় মেয়ে পদ্মমণি সেই আশার প্রধান প্রতিবন্ধক হয়েছে। অগত্যা তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সই করেন।

কালীমার অষ্টসখীদের মধ্যে অন্যতম সখী এবং পরম ভক্ত রাণী রাসমণি জগন্মাতার উত্তম সেবা ও অর্চনার ব্যয়ের জন্যে অগাধ সম্পত্তি দান করে যান। এই প্রসঙ্গে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর গ্রন্থ 'দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ'-তে লিখেছেন,—'···কালীবাড়ির জন্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি রাণী রাসমণি রাখিয়া গিয়েছেন উহার বার্ষিক আয় ছিল ৬৫,০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে সরকারী খাজনা ২২,০০০৲ টাকা, রোড সেস ৫,০০০৲ টাকা ও অন্যান্য ব্যয় ৪,০০০৲ টাকা বাদে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৩৪,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে দেবালয়ের জন্য বার্ষিক প্রায় ১২,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইত। এখন দেবোত্তর সম্পত্তি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার আয় হ্রাস পাইয়াছে। দেবালয়ের কার্য নির্বাহার্থ প্রায় পঞ্চাশজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। ভবতারিণীর পূজক, রাধাকান্তের পূজক, তিনজন শিবপূজক, খাজাঞ্চি ও তাঁহার সহকারী, মুহুরী, ভাণ্ডারী, তিনটি পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন

টহলদার, তিনজন কীর্তনীয়া, ফরাস মালাকর, কর্মকার, নাপিত, ছয়জন দারোয়ান, পাঁচজন মালী, চারিজন নহবতওয়ালা, ছয়জন পরিচারক ও পরিচারিকা, তুইজন ভারী, গাজী সাহেবের পরিচারিকা, রাজমিস্ত্রী, রজক, ঝাড়ুদার, ভিস্তি, মেথর ও মুদ্দফরাস। রাণী রাসমণির কুলপুরোহিতের বংশধরত্রয় শিবমন্দিরের পূজারী। তাঁহারা কালীবাড়ির বেতনভোগী কর্মচারী নহেন। অন্যান্য কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বাবদ তখন তিন হাজার টাকা ব্যয় হইত। পর্বোপলক্ষে বিশেষ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল। কর্মচারীদের বেতন কালীবাড়ির জমির খাজনা প্রভৃতি বাদে বার্ষিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকায় কালীবাড়ির ব্যয় নির্বাহিত হইত।

(দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ইতিবৃত্ত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—পৃঃ ৩৯)

১২৬৮ সালের ফাল্গুন মাস, ইংরেজী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। জড়প্রকৃতির চারদিকে জেগেছে বসন্তের উৎসব। নতুন জীবন ও উদ্দীপনা লাভ করে সুন্দররূপে সেজেছে। তার রূপ ও সৌন্দর্যের অপরূপ প্রতিচ্ছবি মানব-প্রকৃতির আঙিনায় দিয়েছে অভিনব দোলা। এঁকেছে এক সুষমাভরা রঙিন চিত্র। সমগ্র বাংলার মানবমন আজ তার রূপে রূপায়িত—তার সৌরভে সুরভিত। শীতের রুক্ষতা সে এখন বিস্মিত হয়েছে। এখন বোধ করছে অখণ্ড আনন্দ। দেহ-মন সে আনন্দে উৎফুল্লিত। জরা-মরণ-ব্যাধির জ্বালা ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেছে। তথাপি তার ঐ আনন্দের দিনে বাধা হয়ে দাঁড়ালো রাণী রাসমণির বিয়োগব্যথা।

দেহরক্ষার কিছু আগে তাঁকে নিয়ে আসা হ'লো কালীঘাটে গঙ্গাগর্ভে। তখন তাঁর সামনে কতকগুলি আলো জ্বালানো ছিল

দেখে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, সরিয়ে দে, সরিয়ে দে। ওসব রোশনাই এখন আর ভাল লাগছে না। এখন আমার মা (অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আসছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে পুনরায় বললেন রাণীমা, মা এলে! পদ্মমণি যে সই দিলে না, কি হবে মা!

এইটিই রাণীর শেষ কথা।

রাণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবাকুল চারদিক হতে ডেকে উঠলো।

শেষোক্তির পরেই পুণ্যবতী রাসমণি শান্তভাবে জগদম্বার কোলে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করলেন।

চব্বিশ বছর বৈধব্য জীবনযাপন করার পর ১২৬৭ সালে ৯ই ফাল্গুন (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার প্রায় ৬৮ বছর বয়সে রাণী পরলোকগমন করেন। তাঁর স্থূল দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে চন্দন কাঠের চিতায় ভস্মীভূত করা হয়।

পরম তীর্থ দক্ষিণেশ্বরের মহামানব রামকৃষ্ণ যখন শুনলেন রাণী আর এই সংসারে নেই, তাঁর মত আপনভোলা মহাজ্ঞানীর অন্তরস্থল আলোড়িত হয়ে উঠলো অদ্ভুত এক শোকাবেগে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে তিনি রাণীর সম্বন্ধে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, রাণী ছিলেন মা ভবতারিণীর অষ্টসখীদের মধ্যে এক সখী। তিনি মায়ের কাজ এই পৃথিবীতে করবার জন্যে রক্তমাংসের শরীর ধারণ করেছিলেন। তিনি ভাগ্যবতী।

সত্যিই রাণী রাসমণি ভাগ্যবতী। তাঁর জীবনও সার্থক হয়েছে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মের মাধ্যমে। আর এযুগে কর্মই হচ্ছে ধর্ম। তিনি তারই অনুষ্ঠান করে গেলেন। তাই তাঁর সহৃদয় দেশবাসী কৃতজ্ঞতাচিত্তে তাঁর অমর অবদানের কথা স্মরণ করে পুণ্যতীর্থ

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর এক মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাঁর স্মৃতিকে চিরকাল ধরে জাগিয়ে রাখার জন্যে। প্রতিদিন অসংখ্য জনসাধারণ দলে দলে গিয়ে বঙ্গজননীর মূর্তিমতী রাণী রাসমণির সেই মর্মরমূর্তির বেদীমূলে নিজেদের অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করছে।

জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার বংশের সম্পত্তির তালিকা—

জানবাজার ষ্ট্রীট	১৮ নং দোকান	৴১॥৵০
”	৩৭নং বস্তি, ও ৪৬নং বস্তি	৯৸০।৵০
”	৬৪নং জমি	।২।০
”	৯৯নং কুঠী	১৴২।৴০
”	১১১নং বস্তি	।৩৵০
”	১১৫নং কুঠী ও জমি	৴৩৵০
”	১২৫নং জমি	॥০।০
”	১৩০নং জমি	৴২।৵০
ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট	৩নং জমি	
”	৪নং দোকান	৴০॥৴০
”	৫১নং দোতলা কুঠী	১৴২৸০
”	৭১নং কুঠী	৬।০
রাসেল ষ্ট্রী	১২নং দোতলা কুঠী	৯৴১৸৶০
”	৭৪নং ” ”	১৸০৵০
”	৭৫নং ” ”	১।৪॥৶০
”	৭৫১নং আস্তাবল	৴২৸৶০
”	৭৬নং দোতলা কুঠী	১॥০৸৴০
”	৭৭নং জমি	১॥৪৸৴০
মার্কেট ষ্ট্রীট	১৬নং জমি	॥৪৸০
”	১৭নং জমি	॥০৴০
”	৩৮নং, ৩৯নং ও ৪০নং জমি	॥০॥৵০

পোলক	২নং দোতলা কুঠী	৬২৬৶৹
চৌরঙ্গী	২৪নং দোতলা কুঠী	২৵৹
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট	১নং দোতলা কুঠী	১।৶৹
কীড ষ্ট্রীট	২নং তেতলা	৫॥৪॥৵৹
মটার লেন	১৫নং জমি	।২।০
,,	৪৫নং কুঠী	১।২
ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট	৮নং জমি	৩৬৩॥৶৹
,	২৫নং জমি ও দোকান	১৬২
,	২৬নং জমি	২॥০॥০
গোয়ালাটুলী	৪নং জমি	/৪৶৹
,,	৫নং বস্তি	/৩॥৶৹
বেলেঘাটা	বাজার, বাগান, কুঠী, পুকুর	২৫/৩
ভবানীপুর	জগুবাবুর বাজার	৩/০
কালীঘাট	বাগান, কুঠী, পুকুর, গঙ্গারঘাট	২/০
মারকুইস্‌ ষ্ট্রীট	১২নং বস্তি	১/।৶৹
তালতলা	৮৭নং বস্তি	।৪
,,	৯নং বস্তি	/২॥০
ডাক্তার লেন	৬৪নং দোতলা কুঠী	২/৪
কোবার্থ লেন	৩নং জমি	।২॥/০
উমাচরণ দাসের লেন	৪নং জমি	।৩।০
,, ,,	৭নং জমি	৬।৵৹
মনোহরদাস ষ্ট্রীট	৪৭নং কুঠী	/০।৵৹
মির্জাপুর লেন	১০নং গুদাম	॥১।৵৹
রামহরি মিস্ত্রী লেন	জমি	/১।৵৹
নীলমণি হালদার লেন	৩৬নং জমি	॥৪
পুরাতন চীনবাজার	২০১-২০৫ দোতলা	১/২৬৶৹

মুন্সী সদবদ্দি লেন	১নং জমি	।৪৸৶০
দত্ত লেন	৯নং বস্তি	।০৴০
মিস্ত্রি খানসামা লেন	১৬নং জমি	।৪৶০
শাঁখারীটোলা লেন	১২নং জমি	।২৶০
শরিফ সপ্তরী লেন	১নং বস্তি	।০৸০
বেড়ো বরদার লেন	১২নং বস্তি	।৩।০
সিঁথি	বাগান ও পুকুর	৩৴৪

এ ছাড়াও ঘিপুকুর, জগন্নাথপুর, মকিমপুর, কানারা, হোসেনপুর প্রভৃতি আরো কতকগুলি আয়ের সম্পত্তি মফঃস্বলে ছিল।

রাণী রাসমণির কতকগুলি প্রিয় গান ছিল। এই গানগুলি তিনি গদাধরের মুখে শুনে বড় আনন্দ বোধ করতেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ ডুব্ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন॥
খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আমার সে কোন জন।
কবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(কবীর)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

কাম আদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি ;
রসনারে সংগে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন ভাই আমার এই নিবেদন।
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে॥

(কমলাকান্ত)

ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটির-দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার ?

ডাক দেখি মন ডাকার মত
কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে
কেমন কালী থাকতে পারে।
মন যদি একান্ত হও
জবা-বিল্বদল লও।
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে
(মা'র) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।

———

মাগো মা আনন্দময়ী, নিরানন্দ ক'রো না।
তোমার ও দু'টি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥
ভবানী ব'লে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবে আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না॥
অহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি দুঃখরাশি তবু গেল না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না॥

———

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু-মূলে (রে মন) ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি
(ওরে) বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
(যখন) দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড়্গো বলি দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড়্গো বলি দিবি॥

প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি ;
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ।
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি ॥

॥ রাণী রাসমণির জীবনে ঘটনাপঞ্জী ॥

রাসমণির জন্ম	১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন
বিবাহ	১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ
রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ	১২০৮ সাল
প্রীতিরামবাবুর দেহত্যাগ	১৮১৭ (ইং) সাল
হরেকৃষ্ণের দেহত্যাগ	১২৩০ সাল
রাজচন্দ্রের মৃত্যু	১২৪৩ সাল
রাসমণির কোনাগাঁয়ে তিন রাত্রি বাস	১২৪৬ সাল
কাশীধামে যাবার উদ্যোগ	১২৫৫ সাল
দক্ষিণেশ্বরের জমি ক্রয়	১৮৪৭ (ইং) ৬ই সেপ্টেম্বর
মূর্তি প্রতিষ্ঠা	১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার
দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রের স্বাক্ষর	১২৬৮ সালের ৮ই ফাল্গুন
দেহত্যাগ	১২৬৮ সালের ৯ই ফাল্গুন, রাত ৮টা
দেহত্যাগের সময় বয়স	৬৮ বৎসর।

।াণী রাসমণির কেনা কোম্পানির কাগজ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন

দৈনিক পত্রিকা

সংবাদ প্রভাকর, ২রা শ্রাবণ, ১২৫৯ সাল

বিজ্ঞাপন

কোম্পানির কাগজের ক্রয় বিক্রয়কারিগণ এবং অন্যান্যদের প্রতি—

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা অবগত করা যাইতেছে, যে বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাসের সপ্তম দিবসে সুবে বাঙালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুসারে পশ্চাল্লিখিত কোম্পানির কাগজ সকল, যাহার মধ্যে প্রথম নয়খানা, যাহা পূর্ব্বে জগদম্বা দাসীর নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু অবশিষ্ট কয়েকখানা কাগজ যাহা পূর্ব্বে ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তদ্বিষয়ে উক্ত কোর্টের বিচারে এমত সাব্যস্ত হইল যে মহানগর কলিকাতার জানবাজার নিবাসিনী মৃত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিনী বিধবা শ্রীমতী রাসমণি দাসী ঐ সমস্ত কাগজের স্বত্বাধিকারিণী ও কর্ত্রী। একারণ উল্লিখিত কোর্ট হইতে এরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইল যে এইক্ষণে ঐ সমুদয় কাগজ যে যে ব্যক্তির নামে আছে তাঁহারা সেই সেই কাগজে "ইণ্ডোর্স" অর্থাৎ স্বাক্ষর করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রীমতী রাসমণি দাসীকে প্রদান করুন। অতএব সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক ও সাবধান করা যাইতেছে, যে কেহ যেন উক্ত সমুদয় কাগজ অথবা তন্মধ্যে কোন কাগজ ক্রয় না করেন এবং বন্ধক না রাখেন।

কোম্পানির কাগজের বিবরণ

কেতা	পারসেন্ট	নম্বর			তারিখ	সিক্কা	টাকা
১	ফোর	৯২১১			১ মে	১৮৩২	৫০,০০০
১	ঐ	৩২৬৬			১ ফেব্রুঃ	১৮৪৩কোং	২৫,০০০
১	ফাইভ	২৫৭০			১ নভেম্বর	১৮২৫	৫,০০০
১	ঐ	৪৮১৪	অফ	২৮৫৩	১০ ডিসেম্বর	১৮২৭	১০,০০০
১	ঐ	৫৩৬১	অফ	৯৮৫৪	১৬ নবেম্বর	১৮২৭	১৫,০০০
১	ঐ	৭৮৮	অফ	৩৭	১ জানুঃ	১৮৩৫	৭০,০০০
১	ঐ	৩৫৮৯	অফ	২৬৩৩	২৬ এপ্রিল	১৮৩১	৬৫,০০০
১	ঐ	২৫৪৪	অফ	২৬৩৩	২৬ এপ্রিল	১৮৩১	৫,০০০
১	ফোর	৭৬৫৩	অফ	৩৩৬১	১ মে	১৮৩২	২০,০০০
১	ঐ	১০৭০০	অফ	১৮০৩৭	১ মে	১৮৩২	১,২৩,৪০০

জান, নিউমার্চ
শ্রীমতী রাসমণি দাসীর উকীল।

১২ জুলাই, ১৮৫২

নিশানীকর। নম্বর ৩৫৮৯ অফ ২৬৩৩ শিক্কা ৬৫,০০০ টাকার যে এক কাগজ, ঐ কাগজ একত্রীভূত কাগজ, অর্থাৎ ১৮৫২ সালের ৮ জুলাই দিবসের বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশিত পশ্চাল্লিখিত দুই-খানা কাগজে একত্র করা হইয়াছে, যথা, নম্বর ২৪৮১ অফ ২৬৩৩ সিক্কা ৫০,০০০ টাকা এবং নম্বর ২৫০০ অফ ২৬৩৩ সিক্কা ১৫,০০০ টাকা। অপিচ নম্বর ১০৭০০ অফ ১৮০৩৭ সিক্কা ১,২৩,৪০০ টাকার যে এক কাগজ, ঐ কাগজ একত্রীভূত কাগজ, অর্থাৎ পূর্ব্বেকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত নিম্নলিখিত ছয়খানা কাগজে একত্র করা হইয়াছে, যথা, নম্বর ১৮০২৯ সিক্কা ২০,০০০ টাকা। নম্বর ১৮০৩০ সিক্কা ১৭,৬০০ টাকা। নম্বর ১৮০৩৫ সিক্কা ১৫,৬০০ টাকা। নম্বর ১৮০৩৭ সিক্কা ১৩,২০০ টাকা। নম্বর ৩৪৫২ অফ ১১১১৬ সিক্কা ১৫,০০০ টাকা। এবং নম্বর ৮২৫১ অফ ১০০৭৮ সিক্কা ৪২,০০০ টাকা। ইতি—